শেষ বুঝিল রাম
ও
সাধু সাবধান

মাওলানা আবূ তাহের বর্দ্ধমানী

তাওহীদ
পাবলিকেশন্স

উল্টা বুঝিল রাম
ও
সাধু সাবধান

মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানী (রহ.)

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

http://islaminonesite.wordpress.com

উল্টা বুঝিল রাম ও সাধু সাবধান

মাওলা আবূ তাহের বর্ধমানী (রহ.)

বই নং-৩

প্রকাশনায় :

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০২৭১১২৭৬২, ০১১৯০৩৬৮২৭২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬,
০১৯১৯৬৪৬৩৯৬, ০১৬১১৬৪৬৩৯৬

ওয়েব : tawheedpublications.com ইমেল : tawheedpp@gmail.com

প্রকাশকাল :

জানুয়ারী ২০১১ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ : আল-মাসরুর

মূল্য : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-8766-30-2

মুদ্রণ :

হেরা প্রিন্টার্স.

হেমন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

http://islaminonesite.wordpress.com

উল্টা বুঝিল রাম

মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানী (রহ.)

http://islaminonesite.wordpress.com

ভূমিকা

ইসলামে কোন জবরদস্তি নাই। কিন্তু ইসলামের উপর কেউ আঘাত হানলে এই জাগ্রত মুসলিম জাতি কোনক্রমেই তা বরদাশ্‌ত করবে না। ভারত সেবাশ্রমের হেড অফিস কলিকাতা বালিগঞ্জ হতে প্রকাশিত **'ওঁজয়িষ্ণু হিন্দু'** নামক একখানি পুস্তক আমার হস্তগত হয়েছে। উক্ত পুস্তকে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর যেভাবে নির্লজ্জ আক্রমণ চালানো হয়েছে তাতে যে কোন মুসলমানের বিবেক আহত না হয়ে পারে না। তাই আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে উক্ত জঘন্য হামলার প্রতিবাদে **'উল্টা বুঝিল রাম'** প্রকাশ করেছি এবং আবার করলাম।

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সেখানকার সংবিধানে ১৫৩ (ক) ধারায় বলা হয়েছে, এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মাবলম্বীর মনে আঘাত হানতে পারবে না, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারবে না। অথচ ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতাদের নাকের ডগার উপর ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুরীষ উদ্‌গীরণ কি ভাবে সম্ভব হচ্ছে– বুঝলাম না। হস্তীর মুখের দুপাশে বৃহৎ যে দুটি দাঁত দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি চিবাবার জন্য ব্যবহৃত হয় না, চিবাবার দাঁত আলাদা থাকে– সেগুলি বাহির থেকে দেখা যায় না। ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের নীতি যদি গজদন্তের মত না হয় তাহলে ভারত সরকারের উচিত অবিলম্বে উক্ত জঘন্য পুস্তকের প্রচারণা বন্ধ করে দেওয়া।

মোঃ আবূ তাহের বর্ধমানী

http://islaminonesite.wordpress.com

শত বিপ্লব ঝড় ঝঞ্ঝায় হইনিক আমি ধ্বংস,
হউক যতই কঠোর যে তাহা হউক যত নৃশংস।
কত আব্‌রাহা এসেছে লইয়া নিয়ে তার মুখ-হস্তী,
মুছে ফেলে দিতে আমার কাবার হাস্‌তি;
আবাবিল ঝাঁক বরষায়ে শিরে কঙ্কর
মিস্‌মার করি দিয়াছে হেলায় তাহার সে করি লস্কর
কোন সে অত্যাচার-
পারে নাই কভু থামাইতে মোর এই গতি দুর্বার।
এসেছে কোরেশ কুল,
জুলুম-আয়ুধ লইয়া আমায় করিবারে নির্মূল।
হিন্দা খেয়েছে কলিজা চিবায়ে জিন্দা থেকেছি আমি,
কলিজার জোশ্‌ যায়নি আমার থামি।
নূহের প্লাবনে হইনিক আমি তাবা,
যুগে যুগে মোর বেড়ে গেছে মারতাবা।
কত যে সামুদ নেম্রুদ-নাবুদ হয়ে গেছে ধরা পৃষ্ঠে,
অক্ষয়ী চির স্বাক্ষর লেখা আছে মোর এ অদৃষ্টে।
ঈমানের তেজে চির বলিয়ান আমিরে জিন্দাদিল,
আমার এ তেজ দমাতে পারে না শয়তান আজাজিল।

http://islaminonesite.wordpress.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উল্টা বুঝিল রাম

ভারত সেবাংশ্রম সঙ্ঘ ২১১নং রাসবিহারী এভিনিউ বালিগঞ্জ কলিকাতা ১৯, এই ঠিকানা হতে একখানি বই প্রকাশিত হয়েছে। বইখানির নাম **'ওঁজয়িষ্ণু হিন্দু'**। বইখানি প্রকাশ করেছেন স্বামী আত্মানন্দ আর লিখেছেন স্বামী বেদানন্দ।

বইখানি পড়ে মনে হল যে স্বামীদ্বয় কাণ্ড-জ্ঞানহীনতা, পরশ্রীকাতরতা আর সর্বোপরি অসত্যতার সাধনা করেই আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসনে বসতে সক্ষম হয়েছেন। স্বামীদ্বয় পবিত্র কুরআন ও ইসলামের বিন্দু-বিসর্গ পাঠ না করেই শুধু ষড়রিপুর তাড়নায় আল্লাহ, রসূল, কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে খুব দাম্ভিকতার সাথে মূর্খতা-ব্যঞ্জক তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাঁদের এই গবেষণার দ্বারা তাঁরা হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু জাতির কি পরিমাণ উপকার সাধন করতে পেরেছেন জানিনা, তবে তাঁদের সাত্বিক উদারতা আর উন্নত আধ্যাত্মিকতার প্রতি শিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদের যে নিদারুণ বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা সঞ্চারিত হয়েছে তাতে মোটেই সন্দেহ নেই। যে মতলবে তাঁরা 'পরধর্মের ভয়াবহতা' প্রমাণ করতে যেয়ে বেসামাল হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের জঘন্য ভাবে আক্রমণ করেছেন তা উপলব্ধি করা মোটেই কষ্টকর নয়। মুসলমানদের মনে সন্ত্রাসের ভাব জাগিয়ে দেওয়ার আর তাদের প্রতি হিন্দু সমাজকে বিদ্বেষপরায়ণ করে তোলার জঘন্যতম চেষ্টা তারা বহুদিন ধরে চালিয়ে আসছেন। 'রঙ্গিলা রসূল', 'শেখশোল্‌জা ম্যাগাজিন', 'রিলিজিয়াস লিডার্স', 'শক্তিশালী সমাজ', 'মনোহর কাহানিয়া', প্রভৃতি বই পুস্তকগুলি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। অবশ্য জড়বাদী প্রতিমা পূজকগণ ও ইহুদীগণ মুসলমানদের প্রতি যে বিদ্বেষপরায়ণ, মহাগ্রন্থ কুরআনে আমরা অনেক আগেই এ কথা জানতে পেরেছি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"লাতাজিদান্না আশাদ্‌দান্নাসে আদাওয়াতাল্ লিল্লাযীনা আমানু ইয়াহুদা ওয়াল্‌লাযীনা আশ্‌রাকু।"

"নিশ্চয় তুমি ইহুদী ও মুশ্‌রিক্‌দেরকে মুসলমানদের প্রতি সবচেয়ে বিদ্বেষপরায়ণরূপে দেখতে পাবে।"

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন ঃ

"লাতুব্‌লাবুন্না ফী আম্‌ওয়ালিকুম ওয়া আন্‌ফুসিকুম ওয়া তাস্‌মাউন্না

http://islaminonesite.wordpress.com

মিনাল্‌লাযীনা ঊতুল্‌কিতাবা মিন্ কাব্‌লিকুম ওয়া মিনাল্‌লাযীনা আশ্‌রাকু আযান কাসীরা।"

হে মুসলিম সমাজ, আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের ঐকান্তিক প্রেম আর ইসলামের প্রতি তোমাদের অনাবিল শ্রদ্ধার দরুণ তোমরা তোমাদের ধনে প্রাণে কঠোর ভাবে পরীক্ষিত হবে। আর যাদেরকে তোমাদের আগে ঐশীগ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল আর যারা বহু-ঈশ্বরবাদী মুশ্‌রিক, তাদের মুখ থেকে বহু পীড়াদায়ক কটূক্তি তোমাদেরকে শুনতে হবে।

যারা মুশ্‌রিক, যারা লক্ষ কোটি প্রতিমা ও তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা করে, অন্ধকারে হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে যখন যার উপর হাত পড়ে তখনই তাকে যারা উপাস্য দেবতা বলে পূজাঅর্চনা শুরু করে দেয়, তারা যে মুসলিম জাতির বন্ধু নয় ; চির শত্রু, এ কথা কুরআনের উপরোক্ত আয়াত দুটির দ্বারা দিবালোকের মতই পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে।

কোন নীতিকে খণ্ডন করতে হলে সে সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞান অর্জন করা দরকার। না জেনে না শুনে প্রতিবাদ, বিদ্রূপ বা সমালোচনা করা বাচালের শূণ্যগর্ভ আস্ফালন বৈ কিছু না। স্বামী মহারাজদ্বয় কাঁচের ঘরে বাস করে লৌহ দূর্গে ঢিল ছুঁড়ে একান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের জানা উচিত ছিল, চন্দ্রে থুথু নিক্ষেপ করলে চন্দ্রকে কোন দিন কলঙ্কিত করা যায় না বরং সে থুথু ঘুরে এসে নিজের গায়েই পড়ে। তাঁরা শাস্ত্রীয় বাদানুবাদের ভিতর যেভাবে অভদ্রতা, নীচতা ও ইত্‌রামিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তাতে সত্যিই আমরা মর্মাহত। আমি ইচ্ছা করলে স্বামী মহারাজদের শীলনোড়া দিয়েই তাঁদের প্রতিটি বিষদন্তকে চুরমার করে দিতে পারি। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, এই ধরনের কাণ্ড-জ্ঞানহীন স্বামীদের কুকর্মের জন্য সমাজের সকলের মনে আঘাত দেওয়া আমি সমীচীন মনে করি না। তবে আল্লাহ, আল্লাহর কালাম, আল্লাহর রসূল (সাঃ) ও মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে কতকগুলি বক্তব্য পেশ করে তারা গোটা মুসলিম সমাজের মর্মমূলে আঘাত হানার যখন চরম পথ বেছে নিয়েছেন, তখন তাদের প্রতিটি বক্তব্য পরীক্ষা করে দেখতেই হবে।

ওঁজয়িষ্ণু হিন্দু পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় স্বামী বেদানন্দ লিখেছেন ঃ

"মুসলমানদের মতে ইসলাম ভিন্ন আর কোন ধর্ম নাই। ইসলামকে যে গ্রহণ করে নাই সে কাফের আর কাফেরকে ছলে বলে কৌশলে মুসলমান করা, কাফেরের, নারী ও সম্পত্তি লুণ্ঠন করা অথবা হত্যা করা তাদের পূণ্য কার্য্য।"

ওঁজয়িষ্ণু হিন্দুর ৮১ পৃষ্ঠায় স্বামীজী আরও লিখেছেন ঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

"শুধু দিগ্বিজয় ও রাজ্য ঘন লালসায় নয়, ভোগ লালসা-সম্বল অত্যাচার ও ধ্বংস মূলক ধর্ম– ইসলামের রক্তাক্ত তরবারী লইয়া দুরন্ত দানবীর পরাক্রমে আসিল– মুসলমান জাতি। দুর্বার ঐসলামিক প্লাবনে হিন্দু ধর্মের দুর্জয় স্বরূপ– লক্ষ লক্ষ মঠ, মন্দির, বিহার, তপোবন, বিশ্ববিদ্যালয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল; লক্ষ লক্ষ শাস্ত্র-গ্রন্থ অগ্নিমুখে এবং লক্ষ লক্ষ বিদ্বান, পণ্ডিত, অধ্যাপক, শ্রমন, ব্রাহ্মণ তরবারী মুখে সমর্পিত হইল; ছলে বলে কৌশলে হিন্দু নিপীড়ন চলিল।

ওঁজয়িষ্ণু হিন্দু ১০১ ও ১০২ পৃষ্ঠায় স্বামী মহারাজ আরও লিখেছেনঃ

"মুহম্মদের মৃত্যুর পর যে খলিফা হইল সে মুসলমানগণের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার ও রাজ্যধন পিপাসা জাগাইয়া তুলিল; ইসলামকে রাজনীতির অঙ্গরূপে গ্রহণ করিল; অত্যাচার, লুণ্ঠন, নর-হত্যা, নারীহরণ প্রভৃতিকে পুণ্যকার্যরূপে প্রচার করিয়া ধর্মের নামে আল্লাহ ও পয়গম্বরের দোহাই দিয়া স্বীয় ধর্মগ্রন্থ কুরআনের মধ্যে পয়গম্বর ও আল্লাহর বাণী ও নির্দেশ বলিয়া উক্ত জঘন্য কার্যের অনুষ্ঠানে অশিক্ষিত পশুভাবাপন্ন ধর্মান্ধ মুসলমান জনতাকে ক্ষেপাইয়া তুলিল। এক হাতে কুর'আন অন্য হাতে তরবারী লইয়া আরব দস্যুদল জগৎজয়ে ছুটিয়া চলিল। চারিদিকে রক্তপাত, নৃশংসতা, কদাচার ও ধ্বংসের প্লাবণ বহিয়া চলিল।

ওঁজয়িষ্ণু হিন্দু পুস্তকের ১০৩ পৃষ্ঠায় বেদানন্দ স্বামী আরও লিখেছেনঃ

যিনি কুরআন পড়িয়াছেন এবং ইসলামের বিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করিয়াছেন– তিনিই স্বীকার করিবেন যে, "কুরআনে যে যে অংশে উচ্চভাব, সদ্‌ভাব ও সুক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা ও আদেশ উপদেশ আছে, সেই সেই বিষয়গুলি হিন্দুধর্ম হইতে গৃহীত; আর যে যে অংশে ধর্মের নামে আল্লাহর নির্দেশের দোহাই দিয়া বর্বরতার সমর্থন রহিয়াছে, সেইটুকুই আদি, অকৃত্রিম আরবীয় বেদুইন-রক্তের প্রেরণা।"

"কাফেরকে (যে ইসলাম গ্রহণ করিবে না) হত্যা কর, তার ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন কর। কাফেরকে হত্যা করিবার জন্য গুপ্তভাবে ওৎ পাতিয়া থাক। কাফেরের নারীগণকে হরণ কর। যতগুলি নারী হরণ করিবে, তার পঞ্চমাংশ পয়গম্বরের প্রাপ্য। তলোয়ারই স্বর্গের চাবিকাঠি। তলোয়ারই ইসলাম প্রচারকের সহায়। যে কাফেরকে হত্যা ও কাফেরের নারী হরণ করিতে পারিবে, সে পরকালে স্বর্গে সুন্দরী হুরীদের সহিত ভোগ বিলাস করিতে পারিবে। ইত্যাদি– এই সব অংশগুলিই পয়গম্বরের কুরআনের আদি, অকৃত্রিম বেদুইন বর্বরতা যাহা কুরআনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া খলিফাগণ মুসলমানগণকে ধর্মান্ধতা ও বর্বরতা দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া রাজ্য ধন পিপাসায় উন্মত্ত করিয়াছিল।"

http://islaminonesite.wordpress.com

আমি বলি স্বামী বেদানন্দের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি পাঠ করে আমাদের আশ্চর্য বোধ করার বা দুঃখ করার কিছুই নেই। কারণ "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহ"– এই যাদের ধর্মের নির্দেশ, তাদেরই একজন ধর্মের চাঁই মহাশয়ের মুখ থেকে ঐরূপ পুরীষ উদ্গীরন হওয়াটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তবে স্বামী মহারাজের দুর্ভাগ্য যে, তিনি সংকীর্ণতার ঊর্দ্ধে থেকে জীবনে একটিবারও পবিত্র কুরআন পাঠ করার সুযোগ পাননি। তা যদি পেতেন, তাহলে তিনি কুরআন সম্পর্কে এরূপ জঘন্য উক্তি কখনই করতে পারতেন না। তাঁকে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিচ্ছি যে, কুরআন পয়গম্বরের কুরআন নয়। কুরআনে খলিফাগণের কোন কপোল কল্পিত কথাও স্থান পায়নি। কুরআন কোন মানুষের রচিত জিনিষ নয়। পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী। কুরআনে ছয় হাজার ছয় শত, ছিষট্টিটি আয়াত আছে এবং উহা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। কোন পরিস্থিতিতে, কোন সময়ে কোথায় কোন কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল তার একটা রেকর্ডও আছে। কুরআনের শেষ আয়াত আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল ৬৩১ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ তারিখে আরাফাতের ময়দানে। তারপরে কুরআনে আর কিছু প্রবেশও করেনি, আর কিছু কাট ছাঁট করে বাদও দেওয়া হয়নি। চৌদ্দশত বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল কুরআন অপরিবর্তিত অবস্থায় আজও বিদ্যমান। এখন কেউ যদি কুরআনের কোন কোন অংশকে কাহারো মন গড়া বলে দাবী করেন তাহলে সেই সেই অংশগুলি যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়নি এবং রসূলের জীবদ্দশায় সেগুলির অস্তিত্ব যে ছিল না, এ প্রমাণ তাকে আগে পেশ করতে হবে। কিন্তু স্বামী বেদানন্দ লালাজীর সে মুরাদ হয়নি। কাজেই খলিফাগণ কুরআনের মধ্যে আল্লাহ ও পয়গম্বরের দোহাই দিয়ে বর্বরতার নীতি ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বলে স্বামীজী যে দাবী করেছেন, সে দাবী তার সম্পূর্ণ মিথ্যা আর কুরআনের কিছু কিছু অংশ হিন্দু ধর্ম হতে গৃহীত হয়েছে বলে তিনি যে আস্ফালন করেছেন, সে আস্ফালনেরও কানাকড়ি মূল্য নেই। মহাগ্রন্থ কুরআন যে একখানা অতুলনীয় গ্রন্থ এ কথা স্বামীজী তাঁর স্বজাতি শ্রীগোপাল চন্দ্র শাস্ত্রীর বাচনিক শ্রবণ করুন।

শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন ঃ

"আরবী ভাষায় সর্বাপেক্ষা মহামূল্য গ্রন্থ আলকুরআন বা কুরআন শরীফ, অন্য নাম, ফুরকান বা মোসাহেফ। ইহা পড়িবার, পড়াইবার, শিখিবার, শিখাইবার গ্রন্থ বটে। আমি নিজে হিন্দু হইয়াও এই গ্রন্থের শত মূখে প্রশংসা করিতে পারি। কুরআন এক মহামূল্য রত্ন। এই রত্ন যে না

http://islaminonesite.wordpress.com

দেখিয়াছে, ধর্ম জগতে এখনও তাহার সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার নাই। যাহারা কুরআনকে বদমায়েশের কল্পিত উপন্যাস বলে, তাহারা রজক বাহকের সহিত সখ্যতা করিতে পারে। ধর্মানুসন্ধিৎসু ও সাহিত্যপ্রিয় ভদ্রলোকদের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ না থাকাই ভাল। ভাবের বেশ তরঙ্গ আছে, ভাষার বেশ উচ্ছ্বাস আছে, পাণ্ডিত্যের ছটা খুব দেখা যায়। ব্যাকরণের বাঁধুনি খুব মজবুত এবং শব্দ বিন্যাসের চাতুর্য্য ও অলঙ্কারের সংযোজনা বড়ই সুন্দর–বড়ই কৌতুহলময়! সমুদয় কুরআন সাগরে এক অপূর্ব বীরত্বব্যঞ্জক তেজের লহরী ছুটিতেছে, সেই তেজে এখনও মুসলমান জাতি বাঁচিয়া আছে। অন্য দিকে ধর্মের শান্তিময় ভাবও ধীরে ধীরে অর্দ্ধলুক্কায়িত হইয়া দেখা দিতেছে। এই দৃশ বড়ই মনোহর। ইহা বেদে বা বাইবেলে নাই। (নব্য ভারত ১১শ খণ্ড ৮ম ও ৯ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

জানিনা কুরআন সম্পর্কে শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্য শুনে লালাজী কি মন্তব্য করেন।

তাছাড়া, "স্বামী বিবেকানন্দের মতে জগতে কুরানই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যাহা আদি ও অকৃত্রিম।" এই উক্তিকে লালাজী এক নিঃশ্বাসে সর্বৈধ ভ্রান্ত বলে স্বামী বিবেকানন্দকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার স্পর্ধা পেলেন কোত্থেকে বুঝলাম না। লালাজীর কপাল ভাল যে স্বামী বিবেকানন্দ বেঁচে নেই।

পবিত্র কুরআনকে যারা ঐশীগ্রন্থ বলে স্বীকার করতে চায়না তাদেরকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"ওয়া ইন্‌কুন্‌তুম্ ফী রাইবিম্ মিম্মা নায্‌যালানা আলা আব্‌দিনা ফা'তু বেসুরাতিম্ মিম্ মিছ্‌লিহী, ওয়াদ্‌উ শুহাদাআকুম মিন্ দুনিল্লাহি ইন্‌কুন্‌তুম ছাদিকীন।"

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তাহলে তার অনুরূপ একটি সূরা তোমরা উপস্থিত কর। আর সহায়তার জন্য নিজেদের সকল অভিভাবকদেরকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

কুরআন সম্পর্কে এই যে চ্যালেঞ্জ, ইহা সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। ভাই স্বামী বেদানন্দ যদি সত্যবাদী হন, তাহলে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা তাঁর উচিত। আর তাঁকে এও প্রমাণ করতে হবে যে, হিন্দু শাস্ত্রগুলিকে মন্থন করে কোন্ কোন্ অংশগুলিকে কোন পণ্ডিত কুরআনের সঙ্গে মিশিয়েছিলেন; আমি তাঁকে তাঁর নরকবাস পর্যন্ত এই প্রমাণের জন্য সময় দিলাম।

বেদানন্দ লালাজী ও তাঁর অন্ধ ভক্তরা জেনে রাখুন, কাফেরের ধন

http://islaminonesite.wordpress.com

সম্পদ লুণ্ঠন করার ব্যাপক ও অবাধ অনুমতি কুরআনের কোথাও নেই। কাফেরের নারীগণকে হরণ কর, যতগুলি নারী হরণ করিবে তার পঞ্চমাংশ পয়গম্বরের প্রাপ্য; তলোয়ারই স্বর্গের চাবি; কাঠিয়ে কাফেরকে হত্যা ও কাফেরের নারী হরণ করিতে পারিবে সে পরকালে স্বর্গে সুন্দরী হুরীদের সহিত ভোগ বিলাস করিতে পারিবে– এ সমস্ত কথাগুলিও কুরআনে কুত্রাপি নেই। কুরআনে ধর্ম মতের বৈষম্যের ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও নারী হরণের অনুমতি দুরের কথা, বিন্দুমাত্র জবরদস্তিও সমর্থিত হয়নি। পরমত সহিষ্ণুতার নীতি কুরআনে এরূপ পরিষ্কার ভাষায় বিঘোষিত হয়েছে যে, তার কোনরূপ পরোক্ষ ব্যাখ্যারও অবকাশ নেই। কুরআনের ঘোষণা ঃ

"লা-ইক্‌রাহা ফিদ্‌দীনি কাত্‌ তাবাইয়ানার রুশ্‌দু মিনাল গাইয়ি।"

ধর্মের বিষয়ে কোন জবরদস্তি নেই। সঠিক পথকে বিপথ হতে স্পষ্টিভুত করা হয়েছে মাত্র।

ফলকথা, কুরআন ধর্মমতের বৈষম্যের দরুণ কাফেরদের ধন লুট করতে বলেছে, তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিতে বলেছে, তাদের নারীদেরকে হরণ করতে বলেছে –এ কথা স্বামী বেদানন্দের স্বামীত্বের মতই মিথ্যে। অবশ্য কুরআনে স্থান বিশেষে হত্যা ও লুণ্ঠনের অনুমতি রয়েছে, কিন্তু তার তাৎপর্য বুঝতে হলে কাণ্ড-জ্ঞান-বিমুখতা আর ধর্মোন্মত্ততা পরিহার করে যে সকল কারণে, আর যে সবক্ষেত্রে এই অনুমতি প্রদত্ত হয়েছে তা অবগত হতে হবে। সমুদয় রাষ্ট্র বিধানেই যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে। শ্রীরাম চন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণও যুদ্ধ করেছেন আর এই সকল যুদ্ধের ফলে এক একটি দেশ শ্মশান আর এক একটি বংশ নির্মূল হয়ে গেছে। বেদানন্দ মহারাজকে এখন যদি কেউ বলে যে, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ নরহত্যা, লুণ্ঠন, নারী হরণ ও অগ্নিকাণ্ডের অবতার ছিলেন আর রামায়ণ ও গীতা হিংস্রতা ও পশু ধর্মের প্ররোচক মাত্র, তাহলে স্বামীজী তাকে কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি দেওয়া ছাড়া কোন সদুত্তর দিতে পারবেন কি? স্বামীজী যদি নিজের চোখের ঢেঁকি দেখতে না পান আর অপরের চোখের তিল অনুসন্ধান করে বেড়ান, তাহলে তাঁকে কি বলা যাবে? তাঁদের বহু রক্ত-পিপাসু উপাস্য দেবতার কথা আমাদের জানা আছে। মা কালীর ভীম-ভৈরব মূর্তি, এক হাতে কাটা মাথা অন্য হাতে খাঁড়া, গলায় মুণ্ডু মালা আমরা বহুবার লক্ষ্য করেছি। মহেন্‌জোদারো হারোপ্পার মত একশত দূর্গ ধ্বংসকারী ঋগ্বেদের ইন্দ্র দেবতার কথাও আমাদের জানা আছে। স্বামীজীকে যদি বলি, এসব হচ্ছে

http://islaminonesite.wordpress.com

আদি অকৃত্রিম হিন্দু বর্বরতা– রক্তের প্রেরণা, তাহলে তিনি কি বলবেন? তাছাড়া ভগবত গীতার যুদ্ধে যে লোক ক্ষয় হয়েছিল আমরা তা বিশেষ ভাবে অবগত আছি। কিন্তু রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) দশ বৎসর ধরে যে কুরআন যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, যার ফলে বার লক্ষ বর্গ মাইল পরিমাণ স্থান হতে জড়পূজা, প্রতিমা পূজা, ব্যাভিচার, মদ্যপান, লুটতারাজ, শোষণ, পীড়ন, নারী নির্যাতন, অত্যাচার, জুলুম ও অরাজকতা চির বিদায় গ্রহণ করেছিল আর এই বিপ্লব সৃষ্টি করতে উভয় পক্ষের যে কয়েক শতের বেশী লোক ক্ষয় হয়নি, স্বামী বেদানন্দ মহাশয় কি তা জানবার সুযোগ পেয়েছেন? হিন্দু নিপীড়নের দাবী স্বরূপ তিনি কুরআনী বর্বরতাকে পেশ করেছেন। কুরআনের বিদ্যায় এই অসাধারণ অভিজ্ঞার জন্য তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়ার বিশেষ দরকার। কোথায় আর কোন্ কোন্ কারণে বৈদিক সত্যতার সাথে কুরআনী সত্যতার সংঘর্ষ ঘটেছে, এই স্ত্রীহীন বাক সর্বস্ব লালাজীকে তা বুঝাবে কে? বৈদিক সত্যতার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে আর তিক্ততা বাড়াবোনা। তবে মুসলমানদের ভারত আক্রমণের মুলে কোন ধর্মের গ্লানি আর তার দাবীদারদের নৃশংসতা আর পরমত অসহিষ্ণুতা দায়ী ছিল তা ইতিহাস আলোচনা করলেই জানা যায়। ভারতের প্রাচীন দ্রাবিড়দের ধর্ম ও সভ্যতার পরিণতি আর বৌদ্ধজাতির ইতিহাস কার বর্বরতা ও পৈশাচিকতার সাক্ষ্য বহন করছে –তা স্মরণ করে আল্লাহ, রসূল, কুরআন ও মুসলমানদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করে লজ্জায় তার মাথা নত করা উচিত ছিল।

স্বামীজীকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কাফেরকে ছলে বলে কৌশলে মুসলমান করা, কাফেরের নারী ও সম্পত্তি লুণ্ঠন করা ও ভেঙ্গে চুরে মেরে কেটে সব শেষ করাই যদি ইসলামের নীতি হত; ইসলাম যদি অত্যাচার ও ধ্বংসমূলক ধর্ম হত; তাহলে মুসলমানগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্বামীজীদের পূর্ব পুরুষগণ কর্তৃক ভারতেশ্বররূপে পূজিত ও কীর্ত্তিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি দেবতা, লক্ষ কোটি প্রতিমা ও ত্রিশ কোটি বৈদান্তিক রক্ষা পেল কেমন করে? যে সুলতান মাহমুদ কর্তৃক সতের বার সোমনাথের মন্দির আক্রমণের কথা খুব জোরে শোরে প্রচার করা হয়ে থাকে, সেই সোমনাথের মন্দির ও তার বিগ্রহগুলি রক্ষা পেল কেমন করে? স্বামীজীর পূর্ব পুরুষদের একটি জলদস্যু দলের যে আড্ডাখানা ছিল সোমনাথের মন্দির, সিন্ধু উপকূলবর্তী এলাকায় আরব মুসলমান বণিকদের

http://islaminonesite.wordpress.com

ধনরাজী লুণ্ঠন করে এনে তারা যে সোমনাথের মন্দিরে জমা করতো –আর সে জন্যই যে সুলতান মাহ্মুদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিল সোমনাথ, এ কথা যদি স্বামমীজী না জানেন তাহলে তাঁকে স্বনামধন্য জ্যোতিষ শাস্ত্র-বিশারদ দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও পরিব্রাজক আবু রায়হান মোহাম্মদ বিন্ আহ্মদ আল্ বিরুনীর জগত বিখ্যাত 'কিতাবুল হিন্দু' গ্রন্থখানা পড়ার অনুরোধ করছি। তাছাড়া দিবলে সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরটিও যে জলদস্যুদের অধিকৃত ছিল। এ কথা ইলিয়ট সাহেব তার History of India তে উল্লেখ করেছেন। সুলতান মাহমুদ দুস্যু-দমনের জন্যই যে বারবার সোমনাথ এসেছিলেন এ কথা সুস্পষ্ট। দুস্যুদেরকে জব্দ করা যে মন্দিরের ক্ষতি সাধন নয়– এ কথা স্বামীজীর বুঝবার মত মগজ না থাকলে তাকে বুঝাবে কে? আমি স্বামী বেদানন্দ লালাজীকে একটি কথা জিরজ্ঞস করি, হে স্বয়ং সিদ্ধ বাকসর্বস্ব স্বামী মহারাজ। 'অত্যাচার ও ধ্বংসমূলক ধর্ম ইসলামের রক্তাক্ত তরবারী লইয়া দুরন্ত দানবীয় পরাক্রমে মুসলমান জাতি যখন আসিল; দুর্বার ঐসলামিক প্লাবণে হিন্দু ধর্মের দুর্জয় দূর্গস্বরূপ –লক্ষ লক্ষ মঠ মন্দির, বিহার, তপোবন, বিশ্ববিদ্যালয় যখন চুর্ণ বিচুর্ণ হইল; লক্ষ লক্ষ বিদ্বান, পণ্ডিত, অধ্যাপক, শ্রমন, ব্রক্ষণ যখন তরবারী মুখে সমর্পিত হইল; চারিদিকে রক্তপাত, নৃশংসতা, কদাচার ও ধ্বংসের প্লাবণই যখন বহিয়া চলিল; তখন আর বাকী থাকিল কি? এমতাবস্থায় আপনার মত স্বামীজী ইসলাম ও মুসলমানদেরকে এরূপ জঘন্য ভাষায় গালি গালাজ করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করলেনই বা কেমন করে? আপনি যে মিথ্যাবাদী আপনার অসংলগ্ন ভাষণগুলি কি তার জ্বলন্ত প্রমাণ নয়?

আজ পৃথিবীর পঁচানব্বই কোটি মুসলমানের কণ্ঠ যে মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দরুদের মোহন গুঞ্জনে মুখরিত; স্বামীজী তাঁর নামটিকে বদমায়েশী করেই শুদ্ধভাবে লেখেননি। যাঁদের জ্ঞান গরিমা, বিদ্যা বুদ্ধি, ত্যাগ-তিতিক্ষা, মহানুভবতা ও চরিত্র মাধুর্য দুনিয়াকে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করে দিয়েছিল, সেই মহামান্য সাহাবা ও খলিফাগণকে যে বেআদব দুস্যু বলে অভিহিত করে ইতরামীর পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেনি, তার মত সন্যাসীর লেখা নিয়ে পাঠক পাঠিকাদের সময় নষ্ট করার অপ্রীতিকর কার্যে ব্রতী হওয়ার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত।

ওঁজয়িষ্ণু হিন্দুর ২৬ পৃষ্ঠায় স্বামীজী লিখেছেন ঃ

আরব দেশে মক্কা ছিল শৈবতীর্থ। কাবা মসজিদটিই ছিল সর্ব প্রধান

http://islaminonesite.wordpress.com

শিবমন্দির। .....কাবা মসজিদে অদ্যপি প্রাচীন শিবলিঙ্গের কৃষ্ণ প্রস্তর বিদ্যমান। হজ্‌যাত্রীগণকে সেই প্রস্তর চুম্বন পূর্বক পবিত্র হইতে হয়।

পুনরায় তিনি উক্ত পুস্তকের ১০১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"**মক্কা** তীর্থে ছোট বড় এক লক্ষ শিব মন্দির ছিল। সর্ব প্রধান **শিবমন্দির** পরবর্তীকালে কাবা মসজিদে পরিণত করা হইয়াছে। উক্ত **মন্দিরস্থ** কোষ্টি পাথরের নিমিত সুবৃহৎ শিবলিঙ্গকে চূর্ণ করিয়া ফেলা হয়। অদ্যপি উক্ত শিবলিঙ্গের ভগ্নাংশ কাবা মন্দিরে স্থাপিত আছে। হজযাত্রী মুসলমানগণকে উক্ত প্রস্তর খণ্ড চুম্বন পূর্বক হাজী হইতে হয়।"

এখানেও স্বামী বেদানন্দ মিথ্যাবাদীতার এক জ্বলন্ত রেকর্ড স্থাপন করেছেন। স্বামীজী যখন জগত বিখ্যাত ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাবা মসজিদকে 'সর্ব প্রধান শিবমন্দির' ছিল বলে দাবী করেছেন তখন তাঁর উচিত ছিল উক্ত শিবমন্দির কোন্ শিবপূজারীর দ্বারা কোন্ সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার উল্লেখ করা কিন্তু স্বামীজীর দুর্ভাগ্য যে সে সৎসাহস তার নেই। আমি স্বামীজীকে পরিষ্কার ভাবে জানাতে চাই যে, কাবা মসজিদ কোন কালে শিবমন্দির ছিল না। কাবা মসজিদ মসজিদরূপেই নির্মিত হয়েছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে আদি মানব আদম (আঃ) মহান আল্লাহর উপাসনার জন্য কাবা মসজিদটি তৈরী করেছিলেন। আর বেহেশ্‌ত হতে তিনি যে পাথরটি নিয়ে এসেছিলেন, কৃষ্ণ প্রস্তর হচ্ছে সেই পাথর। নূহ (আঃ)-এর প্লাবণের সময় কাবা মসজিদ নিশ্চিহ্ন হযে গেলে কৃষ্ণ প্রস্তরটি ওখানেই পড়ে ছিল। তার কয়েক হাজার বছর পর ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) অদ্বিতীয় আহাদের উপাসনার জন্য বিশাল ও ভীষণ মরু সমুদ্রের মাঝে কাবা মসজিদ নির্মাণের জন্য ঐ স্থানটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। কুরআনের ঘোষণা, মসজিদ নির্মাণের সময় তাঁরা স্বামীজীদের শিব ঠাকুরের কাছে নয়, মহান আল্লাহর দরবারেই এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন ঃ

"রাব্বানা তাকাব্‌বাল্ মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাছ্ ছামীউল আলিম। রব্বানা ওয়াজ্ আল্‌না মুছ্‌লিমাইনি লাকা ওয়ামিন্ জুর্‌রিইয়াতিনা উম্মাতিম্ মুছ্‌লিমাতাল্‌লাকা, ওয়া আরিনা মানাছিকানা ওয়াতুব্ আলাইনা ইন্নাকা আন্‌তাৎ তাওয়াবুর রহীম। রব্বানা ওয়াবআছ্‌ফীহিম রাছুলাম্ মিন্‌হুম ইয়াত্‌লু আলাইহিম্ আইয়াতিকা ওয়া ইউআল্লিমু হুমুল্ কিতাবা ওয়াল্ হিক্‌মাতা ওয়া ইউজাক্‌কীহিম্ ইন্নকা আন্‌তাৎ তাওয়াবুর রহীম।"

http://islaminonesite.wordpress.com

"প্রভু হে, একমাত্র তোমারই ইবাদত্ গৌরব ও মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা যে কাজ সমাধান করছি, তুমি তা কবুল কর। একমাত্র তুমি আহ্বান শ্রবণকারী ও অন্তরযামী। আমাদের আশা আকাংক্ষা কি তা তোমার অজানা নয়। প্রভু, আমাদেরকে তুমি মুসলিম কর। আমাদেরকে তোমার আজ্ঞাবহ করে তোল। আমাদের বংশধরদের মধ্যে হতে এমন এক জাতিকে উত্থিত কর, তারা আমাদের মতই যেন তোমার আজ্ঞাবহ ও দাসানুদাস হয়। যে পদ্ধতির উপাসনা তোমার উপযোগী আর মনঃপূত হে দয়াময়। তা তুমি আমাদেরকে শিখিয়ে দাও। আমাদের অপরাধ মার্জনা কর প্রভু– তুমি যে অত্যন্ত ক্ষমাশীল। আর তোমার অসমর্থ দাসদের প্রতি তুমি যে বড়ই দয়াশীল। এ শুভ মুহূর্তে আমাদের এ প্রার্থনাও তুমি কবুল কর যেন আমাদের মধ্য হতে সেই রসূলের আবির্ভাব ঘটে, যিনি তাদের সামনে তোমার নিদর্শনগুলি পর পর উপস্থিত করবেন, তোমার বাণী তাদেরকে পাঠ করে শুনাবেন। আল কিতাব ও সুন্নাতের বিজ্ঞান তাদেরকে শিক্ষা দিবেন আর তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে শোধন করে তুলবেন। প্রভু হে! তুমি যে সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাবান তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ঃ

"রব্বীজ্ আল্ হাযাল্ বালাদা আমিনাও ওয়াজ্নুব্নী ওয়া বানিয়া আন্ না'বুদাল আছ্নাম।"

"প্রভু হে! এই মক্কাকে তুমি শান্তির নগরীতে পরিণত কর, আর আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে প্রতিমা পূজার মহাপাপ হতে রক্ষা কর।" বিশ্ব প্রভু মহান আল্লাহ ইবরাহীমের ও পুত্র ইসমাইলের প্রার্থনা কবুল করেছেন। আল্লাহ তাদের প্রতিষ্ঠিত মসজিদকে কাবা মসজিদে পরিণত করেছেন।

যে ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন, "আস্লাম্তু লিরাব্বিল আলামীন।" আমি বিশ্বপতির কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। যে ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন, "ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ হিয়ালিল্লাজী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরযা হানীফাঁও ওমা আনা মিনাল্ মুশ্রিকীন।"

আমি সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর নিয়ামক, কেবল তাঁরই দাসত্ব একনিষ্ঠভাবে বরণ করে নিলাম। আমি কদাচ প্রতিমা পূজক মুশ্রিকদের শ্রেণীভুক্ত নই।

যে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ বাবিলোনিয়ার বিগ্রহগুলিকে ভেঙ্গে চুরমার

http://islaminonesite.wordpress.com

করে দেওয়ার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, যিনি একেশ্বরবাদী মুসলিমগণের জনক ছিলেন, মহান আল্লাহর এবাদতের জন্য সেই ইবরাহীমের প্রতিষ্ঠিত কাবা মসজিদকে বেদানন্দ লালাজী বলছেন কিনা –'শিবমন্দির।' কি আশ্চর্য আবিষ্কার! ইবরাহীম (আঃ)-এর বহু বছর পর মুশ্‌রিকানা জাহিলিয়াতের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কোন প্রতিমা পুজক যদি কাবা মসজিদে প্রতিমা স্থাপনা করেও থাকেন তজ্জন্য অপরাধী কে স্বামীজীর তা বুঝবার মত মগজ আছে কি? কোন এক ক্ষুধার্তকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল "এক আর একে" কত হয় বলতে পার? সে নাকি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিল "দুই রুটি।" এই কামাতুর লিঙ্গ পূজারীরও অবস্থা দেখছি তাই, তিনি পৃথিবীর সর্বত্র লিঙ্গেরই প্রতীক দর্শন করে থাকেন, তাই তিনি মহাপবিত্র কাবা মসজিদকে শিব মন্দির আর কাবার অন্যতম বাহু হজরে আস্‌ওয়াদ্‌কে শিব লিঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন। আর আরবের মত একটা দেশে এক লক্ষ শিবের মন্দিরও তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। আমি স্বামীজীকে জোর গলায় জানিয়ে দিচ্ছি যে, আরবের সেমেটিক প্রতিমা শাস্ত্রের কোন কেতাবে লিঙ্গ পূজার নাম গন্ধও পাওয়া যাবে না। তবে এ সুরুচি ও শ্লীলতা যে স্বামীজীদের বৈশিষ্ট্য তা আমরা স্বীকার করছি।

হজরে আস্‌ওয়াদ যে আদম (আঃ)-এর স্মৃতি চিহ্ন একথা ইতিহাস থেকে প্রমাণিত। আখ্‌বারে মক্কার ১ম খণ্ডের ৭ম পৃষ্ঠায়, ইবনু সাদের প্রথম খণ্ডের ১২ পৃষ্ঠায়, ইবনু জরিরের ১ম খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠায়, বিদায়া ওয়ান্ নিহায়ার প্রথম খণ্ডের ৮০ পৃষ্ঠায়, তাবাকাতের প্রথম খণ্ডে ১৫ পৃষ্ঠায় ও তাবারীর প্রথম খণ্ডের ৬১ ও ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে 'হজরে আস্‌ওয়াদ' দুনিয়ার কোন পাথর নয়। যে সকল বস্তু বেহেশ্‌তের স্মৃতিরূপে আদম (আঃ) সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন 'হজরে আস্‌ওয়াদ' তন্মধ্যে একটি। মুসলিম বিদ্বেষীদের শিরোমণি সেল সাহেবও তাঁর A Comprehensive commentary on the Quran নামক পুস্তকের ১৮৪ পৃষ্ঠায় 'হজরে আস্‌ওয়াদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বার্টন সাহেবের অভিমত পেশ করে যে টীকা দিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে– Burton thinks it is an AEROLITE অর্থাৎ বার্টন সাহেব 'হজরে আস্‌ওয়াদ'-কে উল্কাজাত প্রস্তরখণ্ড বলে মনে করেন। হজরে আস্‌ওয়াদ যে ঊর্ধাকাশ হতে আগত– একথা মুসলিম বিদ্বেষী পণ্ডিতেরাও অস্বীকার করতে পারেননি। তবে এ কথা সত্য যে, তাঁহার চক্ষু যদি কুফুরীর ও অন্ধত্বের পুরু পর্দায় ঢাকা না থাকতো, তাহলে তাঁরাও উক্ত পাথরকে বেহেশ্‌তের স্মৃতিরূপেই দেখতে পেতেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বামীজী লিখেছেন, "হজ্জযাত্রী মুসলমানগণকে উক্ত প্রস্তর চুম্বন পূর্বক হাজী হতে হয়।" আমি বলি হজ করা স্বামী মহারাজদের লিঙ্গ পূজা নয়। আর উক্ত পাথরটিকে মুসলমানরা ইষ্টানিষ্ট বা মঙ্গলামঙ্গল সাধনকারী বলেও বিশ্বাস করে না। আর ওটাকে চুম্বন দিলেই যে কেউ হাজী হয়ে যায় এ কথাও ঠিক না। হাজী হতে গেলে কি কি করণীয় তা জানার জন্য হজ সংক্রান্ত পুস্তকাদি তিনি পাঠ করুন। না জেনে না শুনে নিজের মতলব হাসিলের জন্য যে তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন, তাতে নিজেকে নির্বোধেরই পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য বহু বিধিনিষেধ পালন ও করণীয় কাজের মধ্যে 'হজরে আস্ওয়াদে' চুম্বন দেওয়াটাও যে হজ্জযাত্রী মুসলমানদের একটি কাজ, এটা আমরা অস্বীকার করছি না। তবে উক্ত চুম্বনকে কটাক্ষ করার কিছু নেই। অবশ্য যারা মাতা পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত, যারা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও ভ্রাতা ভগ্নির স্নেহরস হতে বঞ্চিত, তাদের মত ভাগ্যহীনদের পক্ষেই কেবল মাতা পিতার পদযুগল, পুত্র-কন্যার মস্তক, ভ্রাতা-ভগ্নির কপোলদেশ ও স্ত্রীর ওষ্ঠপুটে চুম্বন করার মর্যাদা ও মাধুর্য্য কল্পনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাদের জেনে রাখা উচিত, নিবিড় স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ মুসলমানরা আদি পিতা আদম (আঃ)-এর স্মৃতিচিহ্নে চুম্বন দিয়ে থাকেন। ওটা পূজা নয়– ওটা হজের জন্য সব কিছু নয়।

বেদানন্দ স্বামী পৃথিবীর অন্যতম কাবা-মসজিদকে শিব মন্দির ও বেহেশ্তী পাথরকে শিবলিঙ্গ বলে আর উক্ত পাথরে চুম্বন দেওয়ার কার্যকে উপহাস করে তিনি সুধীগণের উপহাস্যই হয়েছেন। ইসলামের পবিত্র দেহে তাঁর বিষাক্ত দন্তরাজীর একটিও ফোটাতে সমর্থ হননি।

ওঁজয়িষ্ণু হিন্দুর ১০২ পৃষ্ঠায় স্বামী বেদানন্দ লিখেছেন ঃ

"হিন্দু ধর্মের ন্যায় ইসলামেও ছাগ বলির প্রথা ছিল কিন্তু পরে হিন্দুগণকে জব্দ করিবার জন্য আক্রোশ বলে গরু জবাই প্রবর্তিত হইয়াছে।"

এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, ইসলামে প্রথমে ছাগবলির প্রথা ছিল পরে হিন্দুগণকে জব্দ করিবার জন্য আক্রোশ বলে গরু জবাই প্রবর্তিত হইয়াছে– স্বামীজীর এ উক্তি ষোল আনাই মিথ্যা। স্বামীজী জেনে রাখুন, মুসলমানরা যা ইচ্ছা তাই খেতে পারে না। আল্লাহ যা হালাল করেছেন তাই তাদেরকে খেতে হয় আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে তাদেরকে বিরত থাকতে হয়। মহান আল্লাহ গরু, ছাগল, দুম্বা, উট প্রভৃতি জন্তুর গোশ্ত হালাল করেছেন বলেই মুসলমানরা উহা ভক্ষণ করে থাকে।

http://islaminonesite.wordpress.com

আর কুকুর, বিড়াল, শূকর, গাধা, হাতী প্রভৃতি জন্তুর মাংস হারাম করেছেন বলেই মুসলমানরা উহা থেকে বিরত থাকে। তবে মুসলমানদেরকে গরুর গোশ্‌তের কাবাব খেতে দেখে স্বামীজীর যদি ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে থাকে তাহলে তাঁকে বলি, ঐ দেখুন আপনাদের পূর্ব পুরুষগণ স্মরণাতীত কাল হতে বৌদ্ধ যুগের পূর্ব পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে গোমাংস ভক্ষণ করতেন। ঐ দেখুন ব্যাসঋষি স্বয়ং বলেছেন ঃ "রন্তিদেবীর যজ্ঞে একদিন পাচক ব্রাহ্মণগণ চীৎকার করে ভোজনকারীদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, মহাশয়গণ! অদ্য অধিক মাংস ভক্ষণ করিবেন না, কারণ অদ্য অতি অল্পই গো-হত্যা করা হয়েছে, কেবল মাত্র ২১০০০ একুশ হাজার গোহত্যা করা হয়েছে। (সাহিত্য সংহিতা তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)

সন্ধানী হিন্দু পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে, "বৈদিক যুগে ভারতীয় ঋষিগণ রীতিমত গোমাংসাশী ছিলেন। স্মার্তযুগের সায়াহ্ন পর্যন্তও তাদের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণের জের চলেছিল। (ঐ ৪৭৬ পৃষ্ঠা) বৌদ্ধ যুগের পূর্ব পর্যন্ত স্বামীজীদের বাপ-দাদারা যে প্রচুর পরিমাণে গরুর গোশ্‌ত খেতেন তা ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রণীত Beef in ancient India "প্রাচীন ভারতে গোমাংস" গ্রন্থে, স্বামী ভূমানন্দ প্রণীত 'সোহংগীত', 'সোহং সংহিতা', 'সোহং স্বামী' গ্রন্থগুলিতে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'জাতি গঠণে বাধা' গ্রন্থে, শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলিতে আর বেঙ্গলী পত্রিকায় পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের লেখা গোমাংস বিষয়ক প্রবন্ধ ইত্যাদিতে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখিত আছে। তখন গো-বলি গো-হত্যা, গোমেধ যজ্ঞ, গোমাংস ভক্ষণ মোটেই নিষিদ্ধ ছিল না। মধু ও বৃষ মাংস না খাওয়ালে তখন অতিথির যত্নই হতো না। সে যুগ গো-হত্যা ও অতিথি –উভয়েই গোঘ্ন নামে কীর্তিত হতেন। গো-হত্যা বন্ধ হলো বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের সময় হতে। তিনিই যজ্ঞে পশুবলি, জীবহত্যা, মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু বেদ, সংহিতা, সূত্রাদি গ্রন্থ হতে গো-হত্যার বলিষ্ঠ প্রমাণপঞ্জী রয়েছে। স্বামীজী যদি একটু অতীতের দিকে ফিরে যান এবং বেদ, পূরাণ, সংহিতা, সূত্রাদি গ্রন্থগুলি ভালভাবে দেখা-শুনা করেন, তাহলে তিনি অতি সহজে বড় মজাদার গরুর গোশ্‌তের কাবার খাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারবেন।

উক্ত পুস্তকের ১০২ পৃষ্ঠায় স্বামীজী লিখেছেন ঃ

"কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে ইসলামের গোঁড়ামীর

http://islaminonesite.wordpress.com

মধ্যেও হিন্দু সংস্কার ক্রিয়াশীল। ইসলামের দ্যোতক অর্দ্ধচন্দ্র শৈব মতেরই পরিশিষ্ট –শিবের ললাটস্থিত অর্দ্ধেন্দু।

আমি বলি স্বামীজী তার গঞ্জিকা-রাগরঞ্জিত চোখে ইচ্ছা করলে আরও অনেক কিছুই লক্ষ্য করতে পারতেন। যেমন মুসলমানেরা যে তুর্কি টুপি মাথায় দিয়ে থাকে, তার পিছন দিকে কালো রঙ্গের যে ক্ষুদ্র গুচ্ছটি ঝুলতে থাকে, সেটা হিন্দুর মাথার টিকিরই একটা ত্রিয়াশীল হিন্দু সংস্কার।

স্বামী মহাশয় **ওঁজয়িষ্ণু হিন্দুর** ২৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

অন্য ধর্মের প্রবর্তকগণ ধর্মের বালক মাত্র। যীশু, মুহাম্মদ, কংকুচ, জরথুষ্ট্র, মোজেস, লাউট্‌জে প্রভৃতি ধর্মমত প্রবর্তকগণের ন্যায় শত সহস্র অযুত মহাপুরুষ হিন্দু সমাজের গৃহে গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

আমি যদি লালাজীর জীবনে ধিক্ শত ধিক্ যে, তিনি ঐ সব মহামানবদের জীবনসুধা হতে বঞ্চিত। যিশু, কংকুচ, জরথুষ্ট্র, মোজেস, লাউটেজ প্রভৃতি মহাপুরুষদের সম্পর্কে আমি এখন কিছু বলতে চাই না। তবে মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে এতটুকুই বলবো যে, তিনি কোন ধর্মমতের প্রবর্তক ছিলেন না। ইসলাম তার মস্তিষ্ক প্রসূত ধর্ম নয়। আল্লার মনোনীত ধর্ম ইসলামের তিনি ধারক, বাহক ও প্রচারকরূপে মনোনীত হয়েছিলেন মাত্র। বেদে পুরানে, জিন্দাবেস্তায়, তওরাতে, জবুরে ও বাইবেলে তাঁর আগমন বার্তা বিঘোষিত হয়েছে। স্বামীজী যদি অন্ধ সেজে থাকেন তাহলে তার অন্ধত্ব ঘুচাবে কে? তিনি একবার চেয়ে দেখুন বেদের সারাংশ অন্যতম ধর্মগ্রন্থ অল্লোপনিষদে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে ঃ

"অল্লহ রসূল মহাম্মদ রকং বরস্য" আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ তোমাদের বরণীয়।

পারসিক জাতির ধর্মগ্রন্থ জিন্দাবেস্তায় মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের যে ভবিষ্যদ্বানী আছে তার সারমর্ম হচ্ছে, "নিশ্চয়ই পবিত্র আহ্‌মাদ আসবেন, যাঁর নিকট হতে তোমরা সৎচিন্তা, সৎবাক্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করবে।"

মুসা (আঃ) পরিস্কারভাবে বলেছেন ঃ The lord thy God will rise up unto thee a Prophet from the midst of thee of thy brethren like unto me, into him you shall hearake. Deut 18-15.

তোমার সদা প্রভু তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য থেকে একজন আমার মত পয়গম্বরের অভ্যুদয় ঘটাবেন, তাঁর বাক্য তোমরা মনোযোগের সহিত শুনিও।

http://islaminonesite.wordpress.com

যীশু তাঁর শেষ বিদায়কালে শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করে এ কথাই বলেছিলেন– I will pray the Father and He shall give you another Comforter that He may abide with you for ever. John 14-10

"আমি আমার স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করব এবং তিনি তোমাদের জন্য আর একজন 'শান্তিদাতা' প্রেরণ করবেন। তিনি যেন তোমাদের সঙ্গে চিরদিন থাকতে পারেন।" যিশু আরও বলেছিলেন ঃ

It is expedient for you that I go away for if I go not away the Comforter will not come unto you. John 19-7

"আমার উচিত যে আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য চলে যাই, কারণ আমি না গেলে সেই 'শান্তিদাতা' আসবেন না।"

When he is come he will reprove the world of sin, and of rightousness and of Jndgement. John 16-8

"এবং তিনি এসে বিশ্বজগতকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।"

I have yet many things to say unto you, But ye cannot bear them now. Jhon 16-12.

"এখন তোমাদের কাছে আমার বহু কথা বলার ছিল কিন্তু তোমরা সে সব এখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।"

How be it when he, the spirit of truth is come, he will guide you into all truth, for shall not ypeak of himself, but what sover he shall, hear that shall he speak and he will shew you thinks to come. Jhon 16-13.

'যাহোক সেই সত্য আত্মা' যখন আসবেন তখন তিনি পূর্ণ সত্যের পথে তোমাদেরকে পরিচালিত করবেন। কারণ তিনি নিজের তরফ হতে কিছুই বলবেন না। তিনি যা বলবেন প্রভুর নিকট হতে শুনেই বলবেন। আর ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার নমুনাও তিনি তোমাদেরকে দেখাবেন।"

কেবল নবীগণই নন্, মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু 'মূয়র'ও বলতে বাধ্য হয়েছেন,

He was a master mind not only for his own age but of all ages.

বস্তুতঃ রসূল অপেক্ষা মহত্তর মানব, শ্রেষ্ঠতর আদর্শপুরুষ দুনিয়ার পৃষ্ঠে কেউ জন্মেনি আর জন্মিবে না।

মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে ইউরোপের স্বনামধন্য পণ্ডিত বার্ণার্ড'শ বলেছেন ঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

I believe that if a man like Mohammad were to assume the dictatorship of the modern world, He would succeed in solving the problem in a way that would bring it much needed peace and happiness.

"আমি বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মত কোন ব্যক্তি যদি বর্তমান বিশ্বের একচ্ছত্র নায়কের পদ গ্রহণ করতেন তাহলে তিনি এমন এক সমস্যার সমাধান করতে পারতেন, যার ফলে পৃথিবীতে বহু আকাংক্ষিত সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হত।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "তারপর এলেন সাম্যের দূত মুহাম্মদ। .....মুহাম্মদ ছিলেন পয়গম্বর সাম্যের, মানুষের ভ্রাতৃত্বের, সমস্ত মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের (Swami Vivekeanandas vol : IV. The Great Teachers of the world, P P 129-130.

মিষ্টার গান্ধী বলেছেন ঃ "আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, সে যুগের জীবন ধারায় ইসলাম যে স্থান লাভ করেছিল, তা তরবারির বলে নয়। এ ছিল নবীর কঠোর সরলতা, সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ, অঙ্গীকার পালনে একান্ত যত্নশীল, তাঁর বন্ধু ও অনুবর্তী জনগণের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, তাঁর সাহসিকতা, তাঁর নির্ভীকতা, আল্লার প্রতি আর তাঁর নিজের নিয়োজিত প্রচার কার্য্যের প্রতি একান্ত বিশ্বাস, তরবারি নয় এই সকল গুণেই সর্ব বিষয়ে তাঁদেরকে সাফল্যদান করেছিল এবং সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে সক্ষম করেছিল।

(Ouoted in the Vindication of the Prophet of Islam P P 26-27)

বলা বাহুল্য, যাঁর প্রশংসা এ ভাবে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ করেছেন; যিনি জড় ও চৈতন্যের কৃত্রিম ভেদরেখাকে অপসারিত করে মানুষের সামগ্রিক জীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ রেখে গেছেন; যিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক মহাগুরু; যিনি ছিলেন নীতি নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষক; যিনি ছিলেন মহাদার্শনিক; যিনি ছিলেন কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতি বিশারদ, যিনি ছিলেন আদর্শ রাষ্ট্রের জন্মদাতা, প্রতিষ্ঠাতা ও অধিনায়ক; যিনি ছিলেন নূতন অর্থবিজ্ঞানের উদ্ভাবক, প্রবর্তক ও রূপায়ক; যিনি ছিলেন স্বাধীনতার সনদ্‌দাতা, রচয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা; যিনি ছিলেন সাম্য ও সম্প্রীতির অগ্রদূত; যিনি ছিলেন দীনবন্ধু; যিনি ছিলেন সাম্য ও সম্প্রীতির অগ্রদূত; যিনি ছিলেন পরোপকারী; যিনি ছিলেন উদার স্নেহ-প্রবণ ও প্রশান্ত; যিনি ছিলেন অনলবর্ষী-বাগ্মী; যিনি ছিলেন পারিবারিক জীবনে অতিথিপরায়ণ গৃহস্থ,

http://islaminonesite.wordpress.com

স্নেহময় পিতা, প্রিয়তম সুহৃদ, উত্তম প্রতিবেশী, গৃহস্থালীর নিত্তনৈমিত্তিক কার্যের সহচর ও চির প্রেমময় স্বামী, যাঁর সাহিত্য পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ; যাঁর ভাষণের সাথে আজ পর্যন্ত কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহস পায়নি; যাঁর ত্যাগ সাধনা ও তপস্যার দৃষ্টান্ত জগতে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব; যিনি যুপৎভাবে অন্তর লোককে সুরভিত, সুষমামণ্ডিত ও বিশ্ব প্রভুর প্রেমালোকে উদ্ভাসিত আর সমাজ ব্যবস্থাকে শান্তি ও ঋদ্ধির বাস্তবরূপ দিতে সমুন্নত করে তুলেছেন যাঁর মহৎ জীবনের বিচিত্র ও সর্বতোমুখী বিকাশকে স্থান ও কালের দূরত্ব ম্লান করতে পারেনি চিরঞ্জীব ও সদাজাগ্রত সীমাহীন উৎস থেকে যিনি মানব জাতির জন্য জীবনের অমৃত আহরণ করে এনেছিলেন; যাঁর জীবন ছিল জীবন্ত মূর্তিমান কুরআন, যাঁর পবিত্র জীবন আকাশচারী, দিগন্ত প্রসারী ও অনন্তমুখী– সেই মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মত মানুষ হিন্দু জাতির ঘরে ঘরে জন্মেছে বলে বেদানন্দ স্বামী যে আস্ফালন করেছেন, তাতে তাঁকে নিরেট মূর্খ আর কৃপার পাত্র ছাড়া আর কি বলা যাবে? শত সহস্র অযুত জাহান্নামে যাক, লালাজী যদি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মত একজন মহাপুরুষের নাম হিন্দু সমাজের মধ্য হতে দেখাতে পারতেন তাহলে তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতাম। কিন্তু তা না করে তিনি কেবল বাগাড়ম্বরই করেছেন। অবশ্য স্বামী বেদানন্দ যে একজন মহাপুরুষ এবং তার মত শত সহস্র অযুত মহাপুরুষ যে হিন্দু সমাজের ঘরে ঘরে জন্মেছে তা আমরা জানি। তবে একটা কথা, এই সব স্বামীজীরা যে জাতির মহাপুরুষ সেজে ঠিকাদারী করেছেন, সে জাতি কতটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রিয় পাঠক পাঠিকাদের উপর তার বিচারের ভার ছেড়ে দিলাম।

ওঁ জয়িষ্ণু হিন্দুর ১৫ পৃষ্ঠায় স্বামী বেদানন্দ লিখেছেন–

ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের সিদ্ধান্ত–আল্লাহ বা God জগতের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা; কিন্তু তিনিই যে সংহারকর্তা তা ভাবিতে পারে নাই। আল্লাহ বা God কে ধ্বংসকর্তা স্থির করিলে তিনি তো অত্যাচারী, নিষ্ঠুর হইয়া পড়েন; দয়া, স্নেহ, ক্ষমা ইত্যাদি তো থাকে না; এই ভয়ে উক্ত ধর্মের প্রবর্তকগণ আঁত্কাইয়া উঠিয়াছেন! সুতরাং গোঁজামিল দিয়া আল্লাহ বা God কে দয়াময়, ক্ষমাময়, স্নেহময়, প্রেমময়রূপে পরিকল্পনা করিয়া ত্রিতাপ-জ্বালা বিদগ্ধ, দয়া-ক্ষমা-স্নেহ-প্রেমের প্রত্যাশী মানবগণের চোখে ধুলি দিয়াছেন।

স্বামী বেদানন্দের দুর্ভাগ্য যে, তিনি আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলমানদের আকিদার প্রতি কটাক্ষ করে গাঁজাখোরীর পরিচয় দিলেন। আল্লাহকে দয়াময়, স্নেহময়, ক্ষমাময় ও প্রেমময়রূপে স্বীকার করলে, তাঁর মধ্যে যে রুদ্রাত্মক গুণাবলী থাকেনা– এ কথা তাঁকে বলেছে কে, বুঝলাম না। স্বামীজী জেনে রাখবেন, মুসলমানরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ধুর্জটি ও চামুণ্ডার পূজারী নয়। মুসলমানরা এক আল্লাহর উপাসনা করে এবং আল্লাহর রুদ্রাত্মক ও করুণাত্মক এই দুই গুণেই বিশ্বাসী। তারা আল্লাহকে যেমন দয়াময়, প্রেমময়, কৃপানিধান, দানশীল, সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, আশ্রিত-বৎসল ও রক্ষাকারী বলে বিশ্বাস করে, –ঠিক তেমনি তাঁকে রাজ-রাজেশ্বর, প্রবল পরাক্রান্ত, মহাশক্তিমান, শাসনকর্তা, বলিষ্ঠ, বিক্রমশীল, গর্বিত, দৃপ্ত, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ও সংহারকরূপে বিশ্বাস করে থাকে। তবে বিদ্যুতের দৃপ্তি আর মেঘের গর্জনের মধ্যে বৃষ্টির যে কল্যাণধারা নিহিত রয়েছে; আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণে আর ভূমিকম্পের স্পন্দনে পৃথিবীর ভারকেন্দ্র রক্ষা করার যে অসীম মমতা লুক্কায়িত রয়েছে; তুষারপাত আর সমুদ্রোচ্ছ্বাস দ্বারা বসুন্ধরাকে জল প্লাবিত, ধন ধান্যে সুশোভিত ও শীত গ্রীষ্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করার যে করুণা গুপ্ত রয়েছে– সৃষ্টি কর্তার সেই মহান দয়ালু রূপকে স্বামী মহারাজ যদি নিরীক্ষণ করতে না পারেন তাহলে তাঁর অন্ধত্ব ঘুঁচাবে কে?

ওঁজয়িষ্ণু হিন্দুর ১৫ পৃষ্ঠায় স্বামীজী হিন্দু ধর্মের বিশ্ববিজয়ী বৈশিষ্ট্য দেখাতে যেয়ে লিখেছেন ঃ

ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের সিদ্ধান্ত– ভগবান (আল্লাহ বা God) দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, স্বর্গে আছেন। মৃত্যুর পরে জীবকে তার বিচারের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, কেয়ামতের (Day of Judgement) দিনে সেই মহা বিচারকের সম্মুখে সকলকে আনয়ন করা হইবে; পাপের জন্য অনন্ত নরক আর পুণ্যের জন্য অনন্ত স্বর্গ। এরূপ দণ্ড বা পুরস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। এখানে কোন আপীল আপোষ নাই; ..... জন্মান্তর নাই, আত্ম সংশোধনের উপায় নাই।

.....হিন্দু ধর্ম শিক্ষা দিতেছে জন্মান্তর আছে। .....মৃত্যু দেহ-পরিবর্তন মাত্র। জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যেমন নব বস্ত্র পরিধান কর, তেমনি জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া মানবাত্মা নবদেহ গ্রহণ করে। এমনিভাবে জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়া সুখ-দুঃখময় কর্মফল ভোগের দ্বারা ভগবান মানবকে ক্রমশঃ শুদ্ধ পবিত্র, মোহ নির্মুক্ত করিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া নিতেছেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

অপরাধীকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা দণ্ড প্রদান করবেন জেনে স্বামীজীর মাথা গরম হয়ে গেছে দেখছি; তাই হিন্দু ধর্মে জন্ম-জন্মান্তরবাদের পরিকল্পনা এঁটে নেওয়া হয়েছে। স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করি, আপনাদের জন্মান্তরবাদে যে দণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে, সে দণ্ড দণ্ডমুণ্ডের কর্তা দেন বা অন্য কেউ দেন? জন্মান্তর বাদ তো ওরই নাম যে, মানুষ মনের গেলে তার কৃত-কর্মের প্রকৃতি অনুসারে তার আত্মা কোন জন্তু, কোন তৃণলতা বা কোন বৃক্ষে স্থান লাভ করে কৃতকর্মের ফলভোগ করতে থাকে। তারপর পুনরায় সে মানুষের দেহে স্থান লাভ করে কর্ম করে যায়। যার পাপের পরিমাণ বেশী হয় সে নরককুণ্ডে গমন করে এবং সেখানে সে নানা রকমের শাস্তি ভোগ করে থাকে। কিন্তু যদি দুষ্কৃতির সাথে কিছু সুকৃতি থাকে তাহলে সে নরককুণ্ড হতে চন্দ্রলোকে গমন করে। আর যদি কিছু কর্ম বাকী থেকে যায় তাহলে সেই আত্মাকে বায়ু, মেঘমালা ও বৃষ্টির ভিতর দিয়ে পৃথিবীর বুকে পুনরায় অবতরণ করতে হয় এবং তার কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী জন্তু বা উদ্ভিদে রূপান্তরিত হয়ে সে ফল ভোগ করে। তারপর সে মুক্তিলাভ করে মানুষের যোনিতে স্থানান্তরিত হয়। এভাবে সৎকর্মের পরিমাণ বর্ধিত আর অসৎকর্মের সম্পূর্ণ বিরতি না ঘটা পর্যন্ত মানুষ ঐভাবে গমনাগমনের ঘুরপাক খেতেই থাকে। তারপর জড় দেহের বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে আবার সে অন্তরীক্ষে, সূর্য ও চন্দ্রলোকে এবং নিহারিকামালায় বিশ্রাম লাভ করে। তারপর স্বীয় জ্ঞান ও স্বীয় কর্মের মধ্যে কোন ত্রুটি বা স্বল্পতা থাকার দরুণ আবার তাকে মেঘমালা, বায়ু ও শস্য প্রভৃতির সঙ্গে মিশে দুনিয়ায় আসতে হয় এবং আগের মত বিভিন্ন দেহের ভিতর দিয়ে সে প্রতিফল ভোগ করে থাকে। ভালই হোক আর মন্দই হোক, কর্মের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-জন্মান্তরের এ রীতির অবসান ঘটার কোন সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মোক্ষলাভের পরও ছাড়াছাড়ি নাই। জন্মান্তরবাদের নীতিতে বলা হয়েছে এ দুনিয়া মহাপ্রলয়ে যখন বিধ্বস্ত হয়ে যাবে তারপর নতুনভাবে আবার সব তৈরী হবে তখন পুনরায় কর্ম ফলের ঘোরাফেরা চলতেই থাকবে। আবার দ্বিতীয় প্রলয় সংঘটিত হবে তারপর নতুন করে বসুন্ধরা গড়ে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের এই বিরামহীন গোলক ধাঁধা চলতেই থাকবে।

তাহলে স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করি, আপনাদের জন্মান্তরবাদে মোক্ষ কোথায়? কর্মফল দানের জন্য প্রতিফলের যোগ্য সাব্যস্ত হতে হবে। যে কর্মের প্রতিফল আসামীকে দেওয়া হবে, তা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হতে

http://islaminonesite.wordpress.com

হবে। কিন্তু আপনাদের জন্মান্তরবাদে এ তিনটি ব্যবস্থার একটিও আছে কি? মানুষ যে শুকরের যোনিতে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করছে তা সাব্যস্ত করা, সাব্যস্ত করার জন্য বিচারকের কাছে দাঁড়ানো আর তার অপরাধ নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করা –এ সবের কোন ব্যবস্থা জন্মান্তরবাদে আছে কি? যে অপরাধে মানুষকে ফাঁসি দেওয়া হল, সে অপরাধ পর্যন্ত তাকে যদি জানতে না দেওয়া হল; যিনি ফাঁসি দিলেন তাকে যদি দেখার সুযোগ না পাওয়া গেল, বিচারকের ন্যায় বিচার ও বিচারপতিত্বের অধিকার সম্বন্ধে যদি কিছুই জানতে না পাওয়া গেল; যে অপরাধে তাকে ফাঁসি দেওয়া হল তা প্রমাণিত করার জন্য যদি কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত না হল, অপরাধী তার বক্তব্য নিবেদন করার সুযোগই যদি না পেল –তাহলে সেরূপ বিচার-পদ্ধতির পরিকল্পনা মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস, আশা, শান্তি, ভরসা, শংকা ও অনুশোচনার কোন ভাব জাগিয়ে তুলতে পারে কি?

স্বামী মহারাজকে বলি, আপনাদের পুনর্জন্মবাদের দার্শনিকতা তো এই দুনিয়াকেই কর্মফলের ক্ষেত্ররূপে সাব্যস্ত করেছে। ইহজগতকে কর্মফলের ক্ষেত্ররূপেই যখন মেনে নিয়েছেন তখন জীবনের উদ্দেশ্যই তো আপনাদের ব্যর্থ হয়ে গেছে। কেননা স্থিতিমান জগতকে প্রতিফলের ক্ষেত্ররূপে মেনে নিতে গেলে কর্মের পূর্বে কর্মফলের বিদ্যমানতা স্বীকার করে নিতে হয়। কর্মবিহীন কর্মফলের বিদ্যমানতা স্বীকার করে নিতে হয়। কর্মবিহীন কর্মফলের ব্যবস্থা যেমন যুক্তি বিরুদ্ধ কথা, তেমনি সৃষ্টির প্রথম উদ্ভব ও বিকাশকে কর্মফল প্রসূত বলে দাবী করা –এ যেন ঘোড়ার আগে গাড়ী জোড়ার মত ব্যাপার। বেশী দূর যাব না, স্বামী বেদানন্দের আত্মা সর্বপ্রথম কোন পাপ বা পুণ্যের বলে মানুষের দেহে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে –এই প্রশ্নটি চিন্তা করলেই তিনি জন্মান্তরবাদের অলীকতা বুঝতে পারবেন।

তাছাড়া পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে পুনর্জন্মে মানুষের কর্মের কোন স্বাধীনতাই নেই। এ পৃথিবীতে মানুষ যা করে যাচ্ছে সে হচ্ছে তার পুরস্কার (কাজেই পুনর্জন্মবাদে মানুষের কর্মের যখন কোন স্বাধীনতাই নেই তখন তার প্রতিফল ব্যবস্থার মধ্যে হতভাগ্য স্বামীজী ন্যায় বিচারের চমৎকারিত্ব হৃদয়ঙ্গম করলেন কেমন করে?

স্বামীজী জেনে রাখুন, পুনর্জন্মবাদের প্রথম ও শেষ উভয় অংশই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও প্রহেলিকার কুজ্ঝটিকায় আবৃত, তাই ইসলামে উহার স্থান নাই। ইসলামে ইহজগতকে কর্মক্ষেত্র ও পরজগতকে কর্মফলের ক্ষেত্র বলা

http://islaminonesite.wordpress.com

হয়েছে। এবং মহান আল্লাহ এই দুনিয়ায় যুগে যুগে কালে কালে নবী ও রসূলগণকে পাঠিয়েছেন মানুষকে ন্যায় অন্যায় ও ভাল-মন্দ বুঝবার জন্য। এখন যদি কেউ অন্যায়কে ত্যাগ করে ন্যায় পথে থেকে শুদ্ধ পবিত্র হতে না পারে তাহলে নির্ধারিত তারিখে ফল তো তাকে ভোগ করতেই হবে; স্বামীজী একটু বিদ্রুপ করে বলেছেন কিয়ামতের বিচারে আপীল আপোষ নাই। আমি বলি; তাহলে স্বামীজীদের পুনর্জন্মবাদে আপীল আপোষ আছে নাকি/ এবং সে আপীল আপোষের ঠিকাদারী বোধ হয় আপনারই হাতে নিয়েছেন? স্বামীজী জেনে রাখবেন, কিয়ামতের দিনেই এর ফয়সালা হবে।

ওঁজয়িষ্ণু হিন্দুর ১০৮ পৃষ্ঠায় স্বামীজী লিখেছেন ঃ

ইসলাম ধর্মের সিদ্ধান্ত, ভগবান তাঁর সৃষ্টজগৎ থেকে পৃথক। কিন্তু বীর্যবান হিন্দুসাধক তপস্যার বলে বিশ্ব-বৈচিত্রের অন্তরালে অবস্থিত ঐক্যকে আবিষ্কার পূর্বক সিদ্ধান্ত দিলেন "বিশ্বনাথ ও বিশ্বজগৎ এক অভিন্ন; যাতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ত্যভি সংবিশন্তি তদব্রহ্ম।" ভগবান হইতে ইহার উৎপত্তি, ভগবানই স্থিতি, ভগবানের মধ্যে ইহা বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে। হিন্দু ধর্ম ভিন্ন আর কোন ধর্মে এই সাধনার বীর্য, ভাব ও জ্ঞানের উচ্চতা, এরূপ উচ্চতম উপলব্ধির কল্পনাও দেখা যায় না, সাধনা তো দূরের কথা।

স্বামী মহারাজ ইসলাম ধর্মে ভগবান এর অস্তিত্ব কোথায় পেলেন তাই ভাবছি। ভগবান হচ্ছেন স্ত্রীদূর্গা বা ভগবতি দেবীর অন্যতম স্বামী। ইসলামে তো শ্রীদূর্গা, ভগবতী বা ভগবানের কোন অস্তিত্বই নেই; এই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও অধিপতি যিনি, ইসলামে তিনিই 'আল্লাহ' নামে অভিহিত। সে জন্য মুসলমানরা তাঁকে 'আল্লাহ' বলে ডেকে থাকেন। এবং 'আল্লাহ' যে তাঁর আসল নাম, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, সৃষ্টির আদি হতে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মানুষ কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ নামে অভিহিত করেনি। আরবের পুরাতন সেমিটিক জাতি বহুদলে ও বহু গোত্রে বিভক্ত হয়ে পৃথিবীর বহুস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা সকলেই যে বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টিকর্তাকে আল্লাহ নামে ডাকত, এ কথা তাদের ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়।

আল্লাহ শব্দের অপভ্রংশ হিব্রু ভাষায় এল, এলোয়া ও এলোহিমরূপে আর সংস্কৃত ভাষায় 'অল্ল' 'অল্লা' রূপে দেখতে পাওয়া যায়। হিব্রু ভাষায় 'এল' শব্দের অর্থ God is the all pawerful অর্থাৎ সর্বশক্তিমান পরম প্রভু। Elohim, (Plural of Eloah) The true God. The Greator and moral Governor (the Hebrew title of most Frequent occurance in the old Testament)

http://islaminonesite.wordpress.com

এলোহিম, এলায়ার বহুবচন, সত্য প্রভু স্রষ্টা ও নৈতিক শাসনকর্তা। বাইবেলের পুরাতন বিধানে সৃষ্টিকর্তার এ উপাধি বহুলভাবে ব্যবহৃত। কালেডিয় ও সিরিক ভাষায় এলাহিয়া শব্দের প্রয়োগ বিশ্ব স্রষ্টার সম্বন্ধেই রয়েছে। অর্থবেদের উপনিষদে আছে– "অল্ল অল্লাম ইলল্লতি ইলল্লাহ।"

উপনিষদের অন্যস্থানে আছে– "অল্ল জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পুর্ণং ব্রহ্মং অল্লাম।" মহাগ্রন্থ কুরআনে প্রভু নিজেকে আল্লাহ নামেই ব্যক্ত করেছেন।

মোটকথা সকল ভাষাতেই বিশ্বস্রষ্টা পরম প্রভুর নাম 'আল্লাহ'। আল্লাহ শব্দের লিঙ্গ ও বচন নেই। আল্লাহ শব্দ বুৎপত্তি সিদ্ধ শব্দ নয়। যাঁর সার্বভৌমত্ব আকাশ সমূহ ও পৃথিবী জুড়ে প্রতিষ্ঠিত, যাঁর বিধানে উর্ধ্বজগত ও ধরিত্রী বক্ষের অণু-পরমাণু নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে; যিনি পূর্ণ গুণের আধার; যিনি সমস্ত ত্রুটি বিবর্জিত ও নিশ্চিত অস্তিত্ব– তিনিই আল্লাহ। আল্লাহ শব্দের কোন প্রতিশব্দ আজ পর্যন্ত কোন ভাষাতেই আবিষ্কৃত হয়নি। তিনি একক ও অদ্বিতীয় এবং পূর্ণ; নিশ্চয় স্বতন্ত্র। তিনি সমকক্ষ বিহীন এবং জন্ম ও জননের অতীত। 'কাজেই ভগবতী দেবীর স্বামী 'ভগবান' কেমন করে 'আল্লাহর' আসন অধিকার করতে পারে স্বামীজী একটু ভেবে দেখবেন।

স্বামীজী বলেছেন, (বীর্য্যবান হিন্দু-সাধক তপস্যার বলে বিশ্ব-বৈচিত্রের অন্তরালে অবস্থিত ঐক্যকে আবিষ্কার পূর্বক সিদ্ধান্ত দিলেন বিশ্বনাথ ও বিশ্বজগৎ –এক অভিন্ন)

স্বামীজীকে বলি আপনাদের হিন্দু ধর্মটা খুব সুন্দর ধর্মই বটে। কোন হিন্দু সাধক ঘাড়গুঁজে চক্ষু বন্ধ করে কিছু আবিষ্কার পূর্বক একটা সিদ্ধান্ত পেশ করলেই যখন সেটা হিন্দু ধর্ম হয়ে যায় তখন আপনাদের ধর্মের মত ধর্ম দুনিয়াতে আছে বলে তো আমার মনে হয় না। ইসলাম কিন্তু কোন সাধকের আবিষ্কৃত সিদ্ধান্ত নয়। ইসলাম বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। পবিত্র কুরআন আল্লাহরই বাণী। আল্লাহ নিজেকে যে ভাবে প্রকাশ করেছেন আমরা তাঁকে সেই ভাবেই বিশ্বাস করি।

"বিশ্বনাথ ও বিশ্বজগৎ –এক অভিন্ন।" কথাটা শুনে আমার কয়েক বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল। কাটোয়া টাউন হতে বাড়ী ফিরার জন্য বিকেল পাঁচটার বাসে চেপেছি, দেখি কয়েকজন হিন্দু মহিলা গঙ্গাস্নান সেরে এসে বাসে উঠলেন। গঙ্গাজলের কলসিগুলোকে সাজিয়ে রেখে আপন আপন সিটে সবাই বসে পড়লেন। দেখলাম একটি মেয়ে বসার 'সিট' না পেয়ে ছেলে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছি। হঠাৎ শুনি মেয়েদের মাঝে হট্টগোল ও

http://islaminonesite.wordpress.com

কান্নাকাটি। চমকে উঠলাম। পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম– মহাশয় ব্যাপার কি? তিনি বললেন ব্যাপার গুরুতর। দণ্ডায়মান মেয়ের কোলের শিশুটি প্রস্রাব করে দিয়েছে আর তা ঐ গঙ্গাজলের কলসীর উপর পড়েছে তাই এত চীৎকার। মহিলাদের একজন বৃদ্ধা ছিলেন, তিনি ধমক দিয়ে বললেন চুপকর সব, চিল্লাস না, শাস্ত্রে আছে ছেলের "মুত' নারায়ণ– এতে কোনই দোষ নেই। কথাটা শুনে সেদিন অনেকে চমকে উঠেছিলেন।

বলাবাহুল্য বৃদ্ধার ঐ কথার দলিল আজ স্বামী বেদানন্দের কাছ থেকে পাওয়া গেল। 'বিশ্বনাথ ও বিশ্বজগত যখন এক অভিন্ন' –তখন সবই তো বিশ্বনাথ। ছেলেটিও বিশ্বনাথ, মেয়েটিও বিশ্বনাথ, প্রস্রাবও বিশ্বনাথ, গঙ্গাজলও বিশ্বনাথ আর পান করবে ঐ বিশ্বনাথ কাজেই গোলমালের আর কিছুই থাকে না।

তবে একটা কথা, লেখা ও লেখক, কবি ও কাব্য, ইমারত ও মিস্ত্রী শিল্প ও শিল্পী তো এক অভিন্ন নয়? প্রশ্ন জাগে, ব্যাঙ্গরূপী বিশ্বনাথকে সর্পরূপী বিশ্বনাথ কেন ভক্ষণ করে? কাঠুরিয়ারূপী বিশ্বনাথ কেন বৃক্ষরূপী বিশ্বনাথকে কর্তন করে? মুরগীরূপী বিশ্বনাথকে কেন শৃগালরূপী বিশ্বনাথ উদরস্থ করে? এক বিশ্বনাথের ভয়ে আর এক বিশ্বনাথ কেন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে? স্রষ্টা সৃষ্টি সবই যখন বিশ্বনাথ, তখন সৃষ্টি কেন নিজের অবস্থা অবগত নয়? কেন সৃষ্টি অন্য এক সৃষ্টির হাত থেকে নিজকে রক্ষা করতে অসমর্থ? এ সব প্রশ্নের কোন যুক্তি সঙ্গত উত্তর স্বামীজীর কাছে আছে কি?

ওঁজয়িষ্ণু হিন্দুর ১৪ পৃষ্ঠায় স্বামীজী বলেছেন ঃ

মহাম্মদের ব্যক্তিত্ব আদেশ ও মতবাদের উপর ইসলামের ভিত্তি। .....মহাম্মদ যদি কোন কালে অনৈসলামিক ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে ইসলামের মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার উপায় থাকে না।

ইসলাম ও মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে স্বামীজী যে মন্তব্য করেছেন, তাতে মনে হয় অতি বড় আজাজিলকেও তিনি টেক্কা মেরেছেন। কারণ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর ব্যক্তিগত আদেশ ও মতবাদের উপর ইসলামের ভিত্তি –বোধহয় অতি বড় আজাজিলও এ কথা বলতে সাহস পায়নি। স্বামীজী জেনে রাখুন, ঐশী গ্রন্থ মহিমান্বিত আল কুরআনের নীতিবাক্য গুলিকে কেন্দ্র করে রসূল (সাঃ) চরিত্র ও আচরণের যে মূল্য নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন, কুরআনের পরিভাষায় তাকে 'ঈমান' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর ঐ ঈমানিয়াতের উপরই হচ্ছে ইসলামের

http://islaminonesite.wordpress.com

ভিত্তি। কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, "ইন্নাদ্‌দীনা ইনদাল্‌লাহিল ইসলাম।" ইসলামই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। আর স্বামীজীদের সৃষ্ট দ্বিত্ববাদ ত্রিত্ববাদ, বহু ঈশ্বরবাদ, জড়বাদ, পিশাচবাদ, সন্ন্যাসবাদ ও জন্মান্তরবাদ ইসলামের ঘোর পরিপন্থী।

মুহাম্মদ (সাঃ) কোন কালে অনৈসলামিক ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হলে ইসলামের আর মাথা তুলে দাঁড়াবার উপায় থাকে না– স্বামীজীর এ উক্তি শুনে হাসব না কাঁদব স্থির করতে পারছি না। লালাজী যদি ইসলামের চৌদ্দশত বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করতেন, তাহলে তিনি এরূপ প্রলাপোক্তি কখনই করতে পারতেন না। যে মহানবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুসলমানরা দুনিয়ার বুকে যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল, দুনিয়ার মানচিত্রকে নতুন ভাবে এঁকে দিয়েছিল, কর্ডোভা, গ্রানাডা, সেভিল ও বাগদাদের ইউনিভারসিটি তৈরী করেছিল, যে মহানবীর পবিত্র নামের মোহন গুঞ্জনে পঁচানব্বই কোটি মানুষের কণ্ঠ আজ মুখরিত, যে মহানবীর উম্মত সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে, –সে মহানবীর নাম দুনিয়া থেকে মুছে যাবার যারা স্বপ্ন দেখছে, তাদেরকে কোন্ ভাষায় কথা বলে সান্ত্বনা দিব ভেবে পাচ্ছি না। তবে বেদানন্দ লালাজীকে এতটুকু আশ্বাস দিচ্ছি যে, তিনি তাঁর নরকবাস পর্যন্ত সেই দিনের জন্য প্রতীক্ষা করুন।

বইখানির ২০ পৃষ্ঠায় স্বামী বেদানন্দ লিখেছেন ঃ

ইসলাম ও খৃষ্টনীতিতে কিন্তু বাহ্য অনুষ্ঠান মুখ্য। অন্তরের মনুষ্যত্ব ও মহত্বের বিকাশ প্রকাশ হোক বা নাই হোক মুহাম্মদ বা যিশুকে মানিয়া নামাজ বা Prayer করিলেই হইল। যত পাপ যত অনাচার, কদাচার, ব্যভিচার কর না কেন তাহা সমাজে বা রাজদ্বারে অপরাধ হইলেও ধর্মের হানি বলিয়া পরিগণিত হয় না।

এখানে যিশু বা খৃষ্টের নীতি সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই। তবে ইসলাম সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা নির্জলা মিথ্যা। অবশ্য এতে আশ্চর্য বোধ করার কিছু নেই। কারণ কাঙলের রুগী সমগ্র জগৎটাকেই হলুদবর্ণ দেখে থাকে। তাই বলে কি দুনিয়াটা হলুদ বর্ণ? আমি পরিষ্কার ভাবে স্বামীজীকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, সকল ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের মধ্যে ইসলামের প্রধানতম শিক্ষা ও মহত্তম সাধনাই হচ্ছে আত্মার শুদ্ধিদান ও তার বিকাশ। তবে কোন্ কোন্ কাজের দ্বারা অন্তর শুদ্ধ হয় ও অন্তরের মহত্ব বিকাশ লাভ করে আর কিসের দ্বারা অন্তর কলুষিত হয় আর মানব জীবন একেবারে ব্যর্থ ও বিফল হয়ে যায়– পবিত্র কুরআন ও হাদীসে তার

http://islaminonesite.wordpress.com

বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। 'ইসলামে বাহ্য অনুষ্ঠান মুখ্য'– নয়। সকল প্রকার শির্ক, কুফর, ভ্রান্ত আকীদা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, হিংসা, বিদ্বেষ, কপটতা, ঈর্ষা, অহঙ্কার, কলহপরায়ণতা, আত্মশ্লাঘা, পরশ্রীকাতরতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি নিকৃষ্ট ভাবগুলি মন থেকে মুছে দিয়ে, –স্রষ্টার প্রতি তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর প্রতি, তাঁর একত্ব ও আনুগত্যের প্রতি, ফেরেস্তা, ঐশীগ্রন্থ রসুল, মধ্যলোক, বেহেশত ও দোজখের প্রতি বিশ্বাস রেখে আমলের নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, তওবা, ভয়, আশা, শোকর, বিশ্বস্ততা, ধৈর্য, সন্তোষ, আল্লাহর উপর নির্ভরতা, দয়া, বিনয় প্রভৃতির দ্বারা অন্তরকে শুদ্ধ করাই হচ্ছে ইসলামের নীতি। আর সেই সঙ্গে জ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান, কনিষ্ঠদের প্রতি মমত্ববোধ, আল্লাহর একত্বের মন্ত্র উচ্চারণ, মহাগ্রন্থ কুরআনের পঠন-পাঠন, বিদ্যা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, দু'আ ও আল্লাহর নাম স্মরণ, অপবিত্র বা অশৌচ বর্জন, বিবস্ত্রতা বিদূরিতকরণ, ফরজ ও নফল রোজা, হজব্রত পালন, পরোপকার ও জনসেবা, পরিবার পালন, জনক জননীর সেবা, সন্তান পালন, জ্ঞাতিদের সহিত সদ্ব্যবহার, মহৎ লোকদের অনুসরণ, ন্যায়ের জন্য আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ, ঋণ দান ও ঋণ পরিশোধ, প্রতিবেশীর সম্মান, লেন-দেন ও ব্যবহারের সাধুতা ও মাধূর্য, বৈধ ও সৎ উপায়ে উপার্জন, কাউকে কষ্ট না দেওয়া প্রভৃতির দ্বারা অন্তরের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের বিকাশ প্রকাশ করাই হচ্ছে ইসলামের নীতি। অন্তর ও বাহিরের এই শুদ্ধিতা যাঁরা অর্জন করতে পারেন তাঁরাই যে সফলকাম কুরআনে পরিষ্কারভাবে তা ঘোষণা করা হয়েছে, "কাদ্ আফ্লাহা মান তাজাক্কা।" নিশ্চই সফলকাম সেই ব্যক্তি যে অন্তরে বাহিরে শুদ্ধাচারী হতে পারে। কুরআনের অন্যত্র রয়েছে –"কাদ্ আফ্লাহা মান জাক্কা-হা।" সফলকাম হতে পেরেছে সেই ব্যক্তি যে অন্তরের শুদ্ধিতা সাধন করতে পেরেছে।"

অবশ্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই যে চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন না– তা নয়। তবে এ কথা স্বামীজীকে জানাই যে, ইসলাম যেমন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে ধর্মের বাঁধাবাঁধির ভিতর এনে একেবারে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, অন্য কোন ধর্মে তা করেনি বললেই চলে।

সুষ্ঠু ও নির্মল চরিত্র গঠন করার জন্য সুশিক্ষা গ্রহণ করাকে ইসলাম ফরজ আর বাধ্যতামূলক করেই ক্ষান্ত হয়নি, চরিত্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আরও বাধ্যতামূলক কার্যকরী ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। ইসলামের বিধানানুযায়ী মানুষ তার মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা। ঈমানদারের অভিভাবকও হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। তাই অভিভাবক হিসেবে

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রভু পরোয়ারদেগার তার নিজের দাস আর অধীনদেরকে গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিজেই করেছেন। তাদের চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক উন্নতি সাধনের জন্য একটি অতি বিরাট শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন, সেটি হল 'নামাজ'। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীকে সেই শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তার প্রভুর সামনে কমপক্ষে দিনে পাঁচবার উপস্থিত হতে হয়। এখানে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, বাদশাহ ও গোলামের কোন ভেদাভেদ নেই। সর্বশক্তিমান দয়ালু প্রভুর সামনে সকলেই সমান। সকলে একই শিক্ষা, একই যাঞ্চা ও একই প্রার্থনা নিয়ে হাজির। এই নামাজে দৈনিক পাঁচবেলা যে প্রার্থনা করা হয় স্বামী বেদানন্দ যদি তা একটু ভেবে দেখেন তাহলে তিনি অতি সহজেই নামাজের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

সে প্রার্থনাটি হল এই ঃ

আলহামদুলিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। আর্‌রাহমা-নির রাহীম। মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাস্তা'ঈন। ইহ্‌দিনাস্ সিরা-ত্বাল মুস্তাকীম। সিরা-তাল্লাযীনা আন্'আমতা 'আলাইহিম গাইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়ালায্ যা-ল্লীন– (আ-মীন)।

সমস্ত প্রশংসা তোমারই হে প্রভু সৃষ্টি ও পালনকর্তা আল্লাহ। হে দয়ার সাগর ক্ষমাশীল প্রভু– শেষ বিচারের দিনের অধিপতি তুমিই। একমাত্র তোমারই আমরা আরাধনা করি আর একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। প্রভু হে, আমাদেরকে তুমি সুপথগামী কর– সেই পথে যে পথে কেবল তোমার করুণপ্রাপ্ত মহামনীষীগণ চলেছেন, আর সে পথে নহে– যে পথে তোমার অভিশপ্ত আর পথভ্রষ্টগণ চলেছে। (প্রভু হে তুমি আমার প্রার্থনা কবুল কর)।

এই অতুলনীয় প্রার্থনাটিকে স্বামী মহারাজ যদি বিশ্লেষণ করে দেখেন তাহলে তিনি বুঝতে সক্ষম হবেন যে, এ কেবল একটি নিছক আনুষ্ঠানিক প্রার্থনাই নয়। মানুষের চরিত্র গঠনে তাকে সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে তুলতে আর মানব জীবনের আদর্শকে রূপায়িত করতে এর গুরুত্ব বর্ণনাতীত।

দৈনিক পাঁচ বার নামাজ প্রত্যেক মুসলমানের উপর 'ফরজ' অবধারিত। যথাসাধ্য প্রত্যেক মুসলমানকে ফরজ নামাজ জামা'আতের সঙ্গেই পড়তে হয়। পাঁচ বার প্রভুর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁরই শিখানো প্রার্থনা অনুযায়ী নামাজ সম্পন্ন করতে হয়। এই প্রার্থনায় তাঁর সাহায্য ও প্রশংসা করে একমাত্র তাঁর উপাসনার অঙ্গীকার এবং একমাত্র তাঁরই সাহায্য যাঞ্চা করা হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

পরিশেষে প্রার্থনা করতে হয়, যেন তিনি আমাদেরকে সুপথগামী করেন, এমন সুষ্ঠু সরল পথে চালান- যে পথে কেবল মাত্র মহামনীষীগণ চলেছেন আর তার বিপরীত পথ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। কায়মনোবাক্যে এই অতুলনীয় প্রার্থনাটি বারবার করতে হয়। যেখানে আন্তরিকতা নেই, এমন মৌখিক প্রার্থনার স্থান ইসলামে নেই। এ দিকটা হল নামাজের আধ্যাত্মিক দিক– মানুষের আর তার সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক।

নামাজের আর একটা দিক আছে, সেটা হল তার সামাজিক দিক। মহল্লায়, গ্রামের বা শহরের মসজিদে অন্ততঃ পক্ষে ফরজ নামাজ টুকু পড়তেই হয়। বিশেষতঃ সপ্তাহে একটা দিন শুক্রবারে জুম্মার নামাজ মসজিদেই পড়তে হয়। এই নামাজে মনিব, চাকর, আমীর, গরীব, বাদশাহ, গোলাম, বড়, ছোট সকলেই এক সঙ্গে অদ্বিতীয় প্রভুর সামনে সমপর্যায়ে দণ্ডায়মান হয়। এখানে অহঙ্কারের স্থান নেই। একতার, শৃংখলার, সাম্যের, নেতানুগত্যের এখানে চরম শিক্ষা। মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা করার শিক্ষা এখানে নেই। কেবল তাই নয়, এই সমস্ত মিলনের ভিতর ধর্মীয়, সামাজিক আর জাতীয় বিষয় ও বিভিন্ন সমস্যা সমূহের সমাধান ও সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। এই সংগম-স্থানে অবস্থাশালী মুসলমানগণ তাদের গরীব মুসলিম ভাইদের সঙ্গে পরিচিত হয় আর তাদের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে অবগত হয়ে সেগুলো উপশমের ব্যবস্থা করেন। কুরআন ঘোষণা করেছে –"ইন্নাস্ সালাতা তান্হা আনিল্ ফাহ্শায়ে ওয়াল্ মুন্কার।" নিশ্চয় নামাজ সকল প্রকার অন্যায় ও হেয় কাজ কর্ম থেকে রক্ষা করে। বলাবাহুল্য, সত্যিকার যারা নামাজ পড়ে, কোন প্রকার অন্যায় ও লজ্জাকর কাজ তাদের দ্বারা সাধিত হতে পারেনা। তাই দেখা গেছে আরবের বেদুইন, বর্বর ও অসভ্য মানুষগুলো যখন ইসলাম গ্রহণ করে রসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সংস্পর্শে এসে কায়মনোবাক্যে নামাজ পড়েছে তখন যাবতীয় পাপ, অনাচার ও কদাচার তাদের মধ্য হতে চিরতরে বিদূরিত হয়ে গেছে।

স্বামীজী জেনে রাখবেন, যাঁরা রসূল মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে মান্য করে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যথাযথভাবে নামাজ সমাধা করেন, তাঁদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিকটা অতি উন্নত হয় আর চরিত্র হয় তাঁদের অতি উচ্চ ও অতুলনীয়।

এবার স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করি, "মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মানিয়া নামাজ পড়িলেই হইল– "যত পাপ, যত অনাচার, ব্যভিচার, কদাচার কর না কেন, তাহা সমাজে বা রাজদ্বারে অপরাধ হইলেও ধর্মের হানি বলিয়া পরিগণিত

http://islaminonesite.wordpress.com

হয় না।" এরূপ উক্তি তিনি শুনেছেন কোন্ গাঁজাখোরের কাছ থেকে? তিনি যদি জীবনে একটি বারও কুরআনের নীতিবাক্যগুলি শুনবার, পড়বার ও বুঝবার সৌভাগ্য লাভ করতেন তাহলে গাঁজাখোরের মত এরূপ প্রলাপোক্তি তিনি করতেন না।

যে ধর্ম বলে– 'লা তা'কুলু আমওয়ালাকুম বায়নাকু বিল বাতিলে।" তোমরা তোমাদের পরস্পরের ধন সম্পদ অবৈধ উপায়ে ভোগ করো না।

যে ধর্মে –প্রবঞ্চনামূলক ক্রয় বিক্রয়, শঠতামূলক চুক্তি, সুদ, জুয়া, লটারী, অতিরিক্ত মুনাফার উদ্দেশ্যে মজুদকরণ, কলোবাজারী প্রভৃতি হারাম। যে ধর্ম বলে, 'দিমাউকুম– কাদিমাএনা ওয়া আম্ওয়ালুকুম কা আম্ওয়ালিনা' অমুসলমানদের রক্ত ও তাদের ধন সম্পদ মুসলমানদেরই রক্ত ও ধন সম্পত্তির মত পবিত্র ও সুরক্ষিত।

যে ধর্ম বলে– "লা তাক্রাবুয্ যিনা ইন্নাহু কা-না ফাহিশাতাঁও ওয়া সাআ সাবীলা।" তোমরা কদাচ ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না। উহা হচ্ছে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ ও খারাপ পন্থা।

যে ধর্ম ব্যভিচারীকে প্রাণদণ্ড অথবা একশত দোর্রা মারার কঠোর ব্যবস্থা দিয়েছে।

যে ধর্ম বলে– "লা তাব্গিল্ ফাসাদা ফিল্ আর্যি ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল মুফ্সিদীন।" সাবধান, তোমরা কখনো পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তারের দূরাকাংক্ষা পোষণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।

যে ধর্ম বলে, "ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানু ইন্নামাল খাম্রু ওয়াল মায়সিরু– রিজ্সুম্ মিন্ আমালিশ্ শায়তান্ ফাজতানিবূহু" হে বিশ্বাস পরায়ণগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া প্রভৃতি শয়তানের অন্যতম ঘৃণ্য কাজ; কাজেই উহা থেকে তোমরা বিরত হও।

যে ধর্ম বলে, তাআ ওয়ানু আলাল্ বিররি ওয়াত্তাক্ওয়া ওয়ালা তাআ ওয়ানু আলাল ইস্মি ওয়াল্ উদ্ওয়ান।

তোমরা সৎ ও সাধু কর্মের সহায়তা কর আর পাপ ও অত্যাচারের সহায়তা করো না।

যে ধর্ম বলে– "আস্সারিকু ওয়াস্ সারিকাতু ফাক্তাউ আইদিয়াহুমা" যে চুরি করবে সে পুরুষ হোক আর মেয়ে হোক তার হাত কেটে দাও।

মোট কথা, যে ধর্ম অন্যায়, মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, চুরি, ডাকাতি, অনাচার, অত্যাচার, কদাচার, ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া প্রভৃতিকে নিকৃষ্টতম পাপ বলে অভিহিত করেছে, সে ধর্মে "যত পাপ, যত অনাচার

http://islaminonesite.wordpress.com

কদাচার ব্যভিচার কর না কেন ধর্মের হানি বলিয়া পরিগণিত হয় না' বলে স্বামীজী যে মন্তব্য করেছেন তাতে তাকে একটা নিরেট হস্তীমূর্খ ছাড়া আর কি বলা যাবে।

ওঁজযিষ্ণু হিন্দু পুস্তকের ৩২ ও ৩৩ পৃষ্ঠায় স্বামী বেদানন্দ লিখেছেন ঃ

"হিন্দু ধর্মের জঠর থেকে ক্রমান্বয়ে নানক, চৈতন্য, নিত্যানন্দ, রামানন্দ, কবীর দাদু প্রভৃতি সমন্বয়াচার্যের আবির্ভাবে হিন্দু ধর্ম নানা ভাবে ইসলামকে কবলিত করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যের হরিনামের বন্যায় কত যবন হরিদাস বৈষ্ণব ধর্ম যাজন করিয়া হিন্দু বনিতে লাগিল কত দরাফ খাঁ হিন্দু হইয়া হিন্দু দেবদেবীর ভক্ত হইয়া গেল। রামানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত যবন কবীর হিন্দু মুসলমান শিষ্য করিয়া রামনাম মহিমায় একাকার করিতে লাগিল। গুরু নানকের শিখ ধর্মের ছত্রচ্ছয়া তলে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শিখ জাতির কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। বাংলাদেশে সত্যপীরের শিরনী, পীরের দরগায় মানত করিয়া হিন্দু ধর্ম ইসলামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। ফলে মুসলমানগণ কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, শিবলীলা, কীর্তন, কবি ও যাত্রার দলে যোগদান করিয়া হিন্দুর পৌরাণিক দেবদেবী ও মহাপুরুষের চরিত্র অভিনয় ও গান, মা কালীর মন্দিরে মানত ইত্যাদি করিতে শিখিল; হিন্দু জাতি এইভাবে পীর, ফকীর, দরগা ইত্যাদিকে স্বীকার ও আকর্ষণ পূর্বক ইসলাম ও মুসলমানগণকে হিন্দু ধর্মের জঠরাভিমুখে টানিয়া আনিতে ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজ শনিরূপে ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া স্বীয় আধিপত্য কায়েম রাখিবার জন্য f,ভেদনীতি প্রবর্তনপূর্বক মিলন-প্রয়াসী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধাগ্নি পুনরায় জ্বালাইয়া তুলিল। হিন্দুধর্মের পরিপাক ও সমন্বয় শক্তির বিপর্যয় ঘটাইয়া দিল। ইংরেজ যদি বাদ না সাধিত তাহা হইলে বিগত দুই শতাব্দীর মধ্যে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি মুসলমান ধর্ম, সমাজ ও জনতাকে কবল করিতে পারিত।" স্বামীজীর উল্লিখিত মন্তব্য সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, তিনি তাঁর এই কথার দ্বারা ইতিহাসের মূল ঘটনাকে স্বকীয় গরজের তাকিদে বিকৃতরূপ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তিনি যদি ইসলামের ইতিহাসখানা ভালভাবে পাঠ করার তকলীফ স্বীকার করতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে ইসলামের জঠর থেকে খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী, নিজামুদ্দীন আউলিয়া, জালালুদ্দীন তবরেজ, শাহ ওয়ালীউল্লাহ, বায়েজিদ বোস্তামী, কুতুবুদ্দীন বাখতিয়ার কাকী, শাহ জালাল, শাহ আবদুল্লাহ,

http://islaminonesite.wordpress.com

রাহীপীর মাহ্‌মুদ গজন্‌বী ও হামিদ মঙ্গলকোটির মত শত সহস্র ওলী আওলিয়া ও দরবেশের আবির্ভাব ঘটেছিল। কেবল তাই নয়, ব্রাহ্মণ শাসিত যুগযুগান্তরের দলিত মথিত জর্জরিত সাধারণ হিন্দু সমাজের লক্ষ লক্ষ জনতা এই সকল ওলী-আউলিয়াদের সংস্পর্শে এসে একটা অভিনব তওহীদ ও সাম্যমৈত্রীর আদর্শ এবং একটা বলিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার সন্ধান পেয়ে– তাঁদের সেই মোচনীয় অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের নিমিত্ত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় নিতে লাগলেন। তখন ভগবত গীতার সেই "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহঃ" নীতিতে বিশ্বাসী হিন্দু সমাজের পণ্ডিতগণ জাত গেল, সমাজ গেল, ধর্ম গেল বলে চীৎকার করতে লাগলেন। তাঁদের চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী শ্রীচৈতন্য, রামানন্দ প্রভৃতি তথাকথিত সমন্বয়াচার্য্য ও অবতারগণ ঘর সামলানোর জন্য আবির্ভূত হলেন। তাঁরা ভাবলেন, এই ইসলাম-বিমুগ্ধ সমাজকে পুনরায় হিন্দু সমাজে ফিরিয়া আন্‌তে গেলে তাঁদের সামনে একটা উন্নত আদর্শই তুলে ধরতে হবে, তা না হলে তাঁরা কখনই স্বধর্মে ফিরে আসবেন না। তাই তাঁদের রক্ষার গরজে ইসলামের সাম্য মৈত্রী ও তাওহীদের কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করে পৌত্তলিকতা-বর্জিত হিন্দু ভাবধারার ভিত্তিতে একটা মতবাদ সৃষ্টি করে উক্ত তথাকথিক সমন্বয়াচার্য ও অবতারগণ তাঁদেরকে ঘরের দিকে টানতে লাগলেন। অবশ্য এই ঘর সামলানোর ব্যাপারটা যে হিন্দু সমাজে নতুন নয়, স্বামীজীরা আমাদের কাছে কখনই তা অস্বীকার করতে পারবেন না। কেননা, বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ভারতে বৌদ্ধ বিপ্লবের যুগেও ঐভাবে শঙ্করাচার্য প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটেছিল। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন নব প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসনের কল্যাণে হিন্দু সমাজ ইউরোপীয় সভ্যতায় অতি দ্রুত গতিতে আকৃষ্ট হতে চলেছিল, আমরা দেখেছি ঠিক সেই সময় ঐরূপ ঘর সামলাবার জন্য রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি আবির্ভুত হয়েছিলেন আর সেই তথাকথিত হরিনামের বন্যায় জনৈক যবন হরিদাস ভেসে গিয়েছিল। জনৈক দরাফখাঁও গঙ্গাস্তোত্র রচনা করেছিলেন। সেই যুগ হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মুসলমান সাহিত্যিক ও কবিগণ হিন্দুর সমাজ ও দেব-দেবীর বিষয়বস্তু নিয়ে অনেক কিছুই লিখেছেন। অনেক মুসলিম কবি বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন কিন্তু তাঁরা যে হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন– এ কথা তো ইতিহাস বলে না। স্বামীজী

http://islaminonesite.wordpress.com

নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, মুসরিম কবি ফেরদৌসী অগ্নি উপাসক যুগের বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁর বিখ্যাত কাব্য শাহ্‌নামা রচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে অগ্নিপূজক বনে গিয়েছিলেন এ কথা কি স্বামীজী বলতে পারেন? বর্তমান যুগে মুসলিম কবি কায়কোবাদও তাঁর মহাকাব্য মহাশ্মশানে' কালীবন্দনা লিখেছেন। মুসলিম কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনেক কবিতা হিন্দু দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে লিখিত অথচ তাঁরই ইসলামী কবিতার ঝঙ্কারে সারা মুসলিম সমাজ অভিভূত ও মুগ্ধ। হিন্দু ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত মুসলমানের পূর্ব গৌরবের ইতিহাস উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখেছেন। কবি সাহিত্যিকরা সাধারণ সমাজের ব্যতিক্রম, তাই তাঁরা যে কোন বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁদের কাব্যের ও সাহিত্যের পসরা সাজিয়ে থাকেন। কেননা তাঁদের কাজই হলো মানুষের মনে আনন্দ পরিবেশন করা। নিজের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজকে আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের ভাবধারা নিয়ে কোন কবি কোন কবিতা গান বা স্তোত্র রচনা করলেই তিনি হিন্দু হয়ে গেলেন, এ কথা স্বামীজীর আজগুবি আবিষ্কার নয় কি?

স্বামীজী বর্ণিত সেই মহা প্লাবনে মাত্র দু'একটি খড়-কুটাই ভেসে গিয়েছিল সত্য কিন্তু সেই প্লাবনে মুসলিম সংস্কৃতির বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। স্বামীজীদের সেই ভারতেশ্বর বা জগদীশ্বর সম্রাট জালালুদ্দিন আকবর সামান্য একটু বিপর্যয় ঘটিয়েছিলেন –এটা ঐতিহাসিক সত্য। কারণ হিন্দুরা যখন বাদশাহ আকবরের শাহী হেরেমে তাদের ভগ্নী ও কন্যাদেরকে প্রেরণ করতে লাগলেন আর তাঁর বন্দনায় গাইতে লাগলেন ঃ

হেথা এক দেশ আছে নাম পঞ্চগড়।
সেখানে রাজত্ব করে বাদশা আকবর ॥
অর্জুনের অবতার তিনি মহামতি।
বীরত্বে তুলনাহীন জ্ঞানে বৃহস্পতি ॥
ত্রেতাযুগে রাম হেন অতি সযতনে।
এই কলিযুগে ভূপ পালে প্রজাগণে॥

(চণ্ডী মাধবার্চায্য কর্তৃক ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে রচিত দীন-এ-এলাহী প্রচার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তখনি তিনি তাঁর রাজনৈতিক গরজে তথাকথিত হিন্দু সমন্বয়াচার্যগণের সহিত অধিক মেলামেশা ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে

http://islaminonesite.wordpress.com

তাদের প্ররোচনায় তাঁর অভিনব মতবাদ 'দীন-এ-ইলাহী' প্রবর্তন করে বসলেন। কিন্তু তৎকালীন শক্তিশালী আলেমগণের নির্ভয় প্রতিরোধে সেটাও বানচাল হয়ে গেল। তিনি সাধারণের মাঝে তার সেই অদ্ভুত মতবাদ, প্রচার করার মোটেই সাহস করতে পারলেন না। তাঁর 'দীন-এ-ইলাহী' তাঁর দরবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেল।

স্বামী বেদানন্দের কথা হচ্ছে যে, বাংলাদেশে হিন্দু ধর্ম মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করায় মুসলমানদের মধ্যে সত্যপীরের শিরনী, পীরের দরগায় মানত, কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, শিবলীলা, কীর্তণ, কবি ও যাত্রার দলে যোগদান, হিন্দুর পৌরাণিক দেব-দেবী ও মহাপুরুষের চরিত্র অভিনয় ও গান, মা কালীর মন্দিরে মানত প্রভৃতির প্রচলন হয়েছিল।

কিন্তু এ সমস্ত জঘন্য কার্যের প্রচলন কোন সময় হতে ঘটেছিল, স্বামীজী তা জানার সুযোগ পেয়েছেন কি? তাঁর জেনে রাখা উচিত যে, উক্ত জঘন্য কার্যগুলি সম্পূর্ণ অনৈসলামিক। যখন এ দেশে বিদেশী শক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল তখন মুসলমানদের বাদশাহীও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সদ্য স্বাধীনতা হারা মুসলমান যাতে আর মাথা তুলতে না পারে তজ্জন্য বিদেশী শাসকগণ এই স্বামীজীদের ন্যায় সমন্বয়াচার্য হিতাকাঙ্ক্ষীগণের সহায়তায় মুসলমানদের ধন-সম্পত্তি জমি জায়গীর বাজেয়াপ্ত করে তাদেরকে পথের ফকিরে পরিণত করতে আরম্ভ করলেন। বিজাতীয় শাসনের জগদ্দল চাপে চাপে মুসলমানদের ধনবল মনবল সবই তখন ধ্বংসের পথে চলতে আরম্ভ করল। বলাবাহুল্য ঠিক সেই দুর্বল মুহূর্তে দুনিয়ার কিছু উপকার পাবার আশায় অশিক্ষিত বা ধর্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কিছু সংখ্যক মুসলমানের পক্ষে ঐসব জঘন্য কাজে জড়িয়ে পড়াটা কোন বিচিত্র ব্যাপার নয়। কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতির আকর্ষণে যে এরূপ ঘটেছিল তা ঠিক না। মহাকাশচারী পাখী যেমন খাঁচার আকর্ষণে পিঞ্জিরাবদ্ধ হয় না, কোন বিশেষ কারণেই তাকে পিঞ্জিরাবদ্ধ হতে বাধ্য করে –ঠিক সেইরূপ রাজশক্তির চাপে ধনবল-মনবল ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে কিছু সংখ্যক মুসলমানের সেই দশাই ঘটেছিল। কোন বিত্তশালী পরিবার হঠাৎ গরীব হয়ে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তার বংশাবলী সকল দিক দিয়েই অবনতির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। ঠিক সেইরূপ এই রাজ্যহারা, সম্পদহারা, মনোবলহারা,

http://islaminonesite.wordpress.com

শিক্ষা-দীক্ষাহারা সমাজ অবনতির অতলতরে পড়ে যে হাবুডুবু খাবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

মুসলমানদের এই অবস্থা স্বামীজী কথিত ইংরেজগণের Divide and rule ভেদনীতিতে পরিবর্তিত হয়নি। স্বামীজীদের সেই সাধে বাদ সেধেছিল যুগ মুজাদ্দিদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, আল্লামা ইসমাইল শহীদ ও তাঁদের শিষ্যগণের দ্বারা পরিচালিত ওহাবী আন্দোলন আর দেশের শত শত উলামায়ে কিরামের প্রাণপাত প্রচেষ্টা।

বইখানির ৬৭ পৃষ্ঠায় স্বামী বেদানন্দ লিখেছেন ঃ

এই জাতিভেদ-জনিত অভিমানটুকুই হিন্দুয়ানীর শেষ সম্বল।

আমি বলি, ইহাই যদি হিন্দুয়ানীর শেষ সম্বল হয় তাহলে তাঁর এই মহা সাধ যে এমনি শোচনীয় ভাবেই বাদ সাধ্‌বে তাতে আর বিচিত্র কি আছে?

স্বামী মহারাজ উক্ত পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"ইসলাম যখন হিন্দুর বেদান্তের সাধনা ও ভাব গ্রহণ পূর্বক সুফী শাখার জন্মদান করিয়াছিল তখনই কতকগুলি মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।"

উপরোক্ত কথার জওয়াবে আমি স্বামীজীকে জোর গলায় বলবো যে, তিনি ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছেন। আমি স্বামীজীকে ইসলামের ইতিহাসখানা ভালভাবে পাঠ করার আহ্বান করা ছাড়া তাঁর এই অজ্ঞতা-ব্যঞ্জক উক্তির বিষয়ে কি লিখতে পারি? লিখতে গেলে রসূলের জন্মকাল থেকে আরম্ভ করে ইসলামের সমস্ত ইতিহাসখানাই লিখে দিতে হয়। স্বামীজী ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলে দেখতে পাবেন, সূফীবাদ প্রচারে আগেও মুসলিম সমাজে হাজার হাজার মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাছাড়া সূফীবাদ বেদান্তের ভাবধারায় জন্মলাভ করেছে বলে তিনি যে দাবী করেছেন এটা তাঁর একটা ভূয়া দাবী ছাড়া কিছুই না। বলা বাহুল্য, সূফীবাদ মহাগ্রন্থ কুরআনেই আধ্যাত্মিক অংশজাত; এ কথা আবুল হোসেন আল্ আশ্‌আরী, ইমাম গাজ্জালী, জালালুদ্দীন আফ্‌গানী, জুনায়েদ বাগ্‌দাদী, মারুফ্‌কর্খী, নিজামুদ্দীন আওলিয়া প্রমুখ বড় বড় সাধক ও পণ্ডিতগণ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন। তবে বেদান্তের ভাবের সহিত তার কোন কোন অংশের মিল থাকতে পারে; একের ভাবধারার সহিত অন্যের ভাবধারার অনেক সময় মিল ঘটে যায়;

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বামীজী বোধ হয় অবগত আছেন যে, বঙ্কিম চন্দ্রের দুর্গেশ নন্দিনীর ভাবধারার সহিত স্কটের 'আইভানহোর' ভাবধারার হুবহু মিল দেখে তখনকার দিনে অনেকেই বলেছিলেন, বঙ্কিম 'আইভান্‌হোর' অনুকরণে দুর্গেশ নন্দিনী লিখেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "আমি দুর্গেশ নন্দিনী লিখবার আগে 'আইভানহোর' পড়ার সুযোগ পাইনি।" এমতাবস্থায় স্বামী মহারাজ কি বঙ্কিমচন্দ্রকে মিথ্যাবাদী বলবেন? আমার বক্তব্য হচ্ছে, একের চিন্তাধারার সহিত অপরের চিন্তাধারার মিল ঘটলে তাতে আশ্চর্য বোধ করার কিছুই নেই। আর একে অপরে অনুকরণ করেছে –প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত এরূপ দাবী করারও কোন মূল্য নেই। তাছাড়া মহাগ্রন্থ কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "লিকুল্লি কাওমিন হাদ্" আমি আমার বাণীসহ দুনিয়ার সকল দেশে সকল জাতি ও গোত্রের নিকট আমার পয়গম্বর পাঠিয়েছি। এ থেকে বুঝা যায় ভারতেও পয়গম্বর এসেছিলেন। এখন সেই বাণী যদি ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে বিক্ষিপ্ত ও বিকৃতভাবে থেকে যায় আর তার কোন কোন অংশ যদি পবিত্র কুরআনের কথার সহিত মিলেই যায় তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? স্বামীজী মনে রাখবেন, পবিত্র কুরআন আলাদা একটা মতবাদের দাবী করে না। যুগে যুগে, দেশে দেশে আল্লাহর বাণী নিয়ে হাজার হাজার পয়গম্বর দুনিয়ার বুকে এসেছিলেন। পবিত্র কুরআন সেই বাণীরই উন্নত সংস্করণ মাত্র। আর ইহাই ইসলামের শিক্ষা এবং মহা সমন্বয়বাদের বিশ্বজয়ী ব্যবস্থা।

ওঁজয়িষ্ণু হিন্দুর ১০৪ ও ১৯৫ পৃষ্ঠায় বেদানন্দ স্বামী লিখেছেন ঃ

"হিন্দু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বে আকৃষ্ট হইয়া বাংলার ধর্মান্ধ মুসলমান নবাব হুসেন শাহ তাহার ১০টি কন্যাকে ভাদুড়ী ও লাহিড়ী বংশের ব্রাহ্মণ সন্তানগণের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। নবাব সুলেমানও স্বীয় দুহিতার নির্বান্ধাতিশয্যে কালাপাহাড়কে (রাজীবলোচন রায়) কন্যার পানি গ্রহণে বাধ্য করেন। সম্রাট আকবর হিন্দু সংস্কৃতির মহিমায় বিমুগ্ধ ছিলেন। রাজপুতগণের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।"

হায় স্বামী বেদানন্দের দুর্ভাগ্য যে তিনি আসল ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিয়েছেন। স্বামীজী কি বলতে পারেন যে, হুসেন শাহ ও সুলেমান শাহ স্বীয় কন্যাদের বিবাহ যাদের সঙ্গে দিয়েছিলেন তারা ইসলাম গ্রহণের পর বিবাহ করেছিল না পূর্বে বিবাহ করেছিল? স্বামীজী জেনে রাখুন তারা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত হুসেন শাহ ও সুলেমান শাহ তাদেরকে কন্যা দান

http://islaminonesite.wordpress.com

করেননি। স্বামীজীর আরও জেনে রাখা উচিত যে, ইসলাম বিশ্ব মানবের ধর্ম, ইসলাম প্রচারশীল ধর্ম পৃথিবীর যে কোন জাতি ইসলামে দীক্ষিত হলে মুসলিম সমাজের মাঝে সে সম্পূর্ণরূপে মিশে যায়। তখন তাকে কন্যা সম্প্রদান করতে কোন মুসলমানই ধর্মের নীতিতে দ্বিধাবোধ করতে পারে না। তবে এখানে হিন্দু সংস্কৃতির জয় প্রমাণিত হল কোথায়? এখন স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করি, যে সকল হিন্দু মুসলমান বাদশাহ ও বাদশাহজাদাগণকে ভগ্নি ও কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন, তারা কোন সংস্কৃতির মোহে? নবাব বাদশাহগণ যাঁরা হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছিলেন তাঁরা তো মুসলমানই ছিলেন– হিন্দু হয়ে যাননি; বরং হিন্দু মেয়েরাই মুসলমানের ঘরে যেয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এখন যদি বলি, এ থেকে ইসলামী সংস্কতির জয় প্রমাণিত হচ্ছে তাহলে স্বামী মহারাজের কোন জওয়াব আছে কি? তারপর স্বামীজী গোড়ার কথা চিন্তা করেছেন কি না জানি না বলি এ দেশে তো মাত্র কয়েকজন মুসলান এসেছিলেন, তাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক তো ছিল না। এখন সেই কয়েকজন মুসলমান পুরুষ হতে কয়েক শত বছরের মধ্যে কয়েক কোটি হয়ে গেল কেমন করে? লক্ষ লক্ষ হিন্দু নর-নারী ইসলামী সংস্কৃতির মোহে আকৃষ্ট হয়েছিল বলেই কি এ অবস্থার সৃষ্টি হয়নি?

ওঁজয়িষ্ণু হিন্দুর ২১ ও ২২ পৃষ্ঠায় স্বামীজী লিখেছেন ঃ

"প্রতিমা পূজা ও বহু দেববাদ হিন্দু ধর্মের অপর বিশ্ব বিজয়ী বৈশিষ্ট্য। সমাজের মধ্যে যেমন বৃদ্ধ শঙ্করের ন্যায় অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক সংস্কারক ও অতুলনীয় ধীর্যশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি থাকে, আবার তেমনি রত্নাকর দস্যু ও জগাই মাধাইয়ের ন্যায় জড়বুদ্ধি, পশুবৃত্তি মানুষও থাকে। সুতরাং বেদান্তের অবাঙমনসোগোচরম 'একমেবাদ্বিতীয়ম' নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মবাদের যেমন আবশ্যকতা, তেমনি সাধারণ প্রতিমাপূজাদিরও আবশ্যকতা; তবে নিরাকার নির্গুণ ভগবানকে ভাবিবার, বুঝিবার, ধরিবার মত লোক কোটির মধ্যে গুটি; আর জগতের লক্ষ কোটি মানব সাধারণের জন্য আবশ্যক –ভাবময়, স্থুল নামরূপ সমন্বিত ভগবত প্রতিমা। ভগবানের শক্তিকে ভাবের ছাঁচে ঢালিয়া নাম ও রূপে আকারিত করিয়া শ্রবণ-নয়ন-মনের অনুভূতিগম্য করিয়া তোলা আবশ্যক। তাই হিন্দুধর্মের সিদ্ধ সাধক ঋষিদের প্রজ্ঞা-প্রদীপ্ত ধ্যানে অনন্ত ভগবানের অনন্ত ভাব ও শক্তিগুলি মূর্তি ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল? সেই ভাবময় মূর্তিই দেব-প্রতিমা; সেই দেব প্রতিমাকে কেন্দ্র

http://islaminonesite.wordpress.com

করিয়া হিন্দু জাতি ভগবানের পায়ে আত্মনিবেদন করিতে করিতে আত্ম সমর্পণ করিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত ও অভিন্ন হইতে চায়। পেটেন্ট ধর্ম ইসলাম ও ক্রিশচিয়নিটিতে এক নিরাকার আল্লাহ বা God এর ব্যবস্থা কেউ তাহা বুঝুক বা না বুঝুক; ধারণা করিতে পারুক বা না পারুক, মুখে স্বীকার করিয়া নিলেই হইল।

"ভগবানের অনন্তভাব। এই কারণেই ভগবানের অনন্ত শক্তি-মূর্তির প্রতিমা স্বরূপ অসংখ্য দেবতার ধ্যান ও পূজার ব্যবস্থা –হিন্দু ধর্মে। হিন্দু ধর্ম পৌত্তলিক নয়। হিন্দুরা পুতুল পূজা করে না। প্রত্যেক প্রতিমার ধ্যানের মধ্যে এক একটি ভগবত শক্তি ও ভাবের বর্ণনা; সেই চিন্ময়ী শক্তি ও মূর্ত ভাবের পূজাই হিন্দুগণ করে, প্রতিমা বা দেবমূর্তি সেই শক্তি ও ভাবের বাহ্যরূপ এবং সাধক বা সেবকের চিত্তশুদ্ধি ও মনস্থির করিবার অবলম্বন।"

স্বামীজী এই যে পৌত্তলিকতার দার্শনিক ব্যাখ্যা করেছেন আর ইসলামের বিরুদ্ধে তাঁর ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করেছেন, আমি ইচ্ছা করলে এই উক্তির দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিতে পারি। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিতে তাঁর উল্লেখিত উক্তির খণ্ডন না করে আমি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ হতে কিছু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, এতেই স্বামী মহারাজ দেখতে পাবেন তাঁর পৌত্তলিকার দার্শনিক ব্যাখ্যা কেমন ভাবে ফুৎকারে মাকড়শার জালের মত উড়ে গেছে আর কি সুন্দরভাবে ইসলামের নিরাকার আল্লাহর ধারণা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাকার ও নিরাকার' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"আকার আমাদের মনের পক্ষে সুগম হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া নিরাকার যে আকারের দ্বারা সুগম হইতে পারেন তাহা নহে –ঠিক তার উল্টা। মনে করো, আমি সমুদ্রের ধারণা করিতে ইচ্ছা করি। সমুদ্র ক্রোশ দুই তফাতে আছে। আমি তাহা দেখিতে যাত্রা করিবার সময় পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন, সমুদ্র এতই বড় যে স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার ধারণা হইতে পারে না। কারণ আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ– আমরা সমুদ্রের মধ্যে যতই দূরে যাই। অতএব তোমার অন্দরের মধ্যে একটি ছোট ডোবা খুঁড়িয়া তাহাকে সমুদ্র বলিয়া কল্পনা করো। কিন্তু দর্শন শক্তির সাধ্য-সীমা দ্বারা সমুদ্র দেখিয়াও যদি সমুদ্রের ধারণা সম্পূর্ণ না হয় তবে ডোবা হইতে সমুদ্রের

http://islaminonesite.wordpress.com

ধারণা অসম্ভব বলিলেও হয়। অনন্ত আকাশ আমাদের কাছে মণ্ডলবদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া আকাশ দেখার সাধ মিটাতে পারি না, আমি যত দূর পর্যন্ত দেখিতে পাই তাহা দেখিয়া আমার তৃপ্তি হয় না।"

"এই যে প্রয়াস, বস্তুত ইহাই নিরাকার উপাসনা। আমি শেষ পর্যন্ত গিয়াও যখন তাঁহার শেষ পাই না– আমার মন যখন একাকী বিশ্ব ব্রাহ্মাণ্ডের মধ্যে যাত্রা করিয়া বাহির হয়; যখন অগণ্য গ্রহ চন্দ্র তারকার অনন্ত জটিল জ্যোতিরণ্য মধ্যে সে হারাইয়া যায় এবং প্রভাতের প্লাবিত নীলাকাশের মহোচ্চ দেশে বিলীন প্রায় বিহঙ্গের মত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠে তুমি ভূমা আমি তোমার শেষ পাইলাম না। তখন তাহাতেই সে কৃতার্থ হয় –সেই অন্ত না পাইয়াই তাহার সুখ। .....টলেমির জগৎতন্ত্র আমাদের ধারণা যোগ্য। পৃথিবীকে মধ্যে রাখিয়া বদ্ধ কঠিন আকাশে জ্যোতিষ্কগণ সংকীর্ণ নিয়মে ঘুরিতেছে, ইহা ঠিক মনুষ্য মনের আয়ত্বগম্য। কিন্তু অধুনা জ্যোতির্বিদ্যার বন্ধন-মুক্তি হইয়াছে। সে সীমাবদ্ধ ধারণার বাহিরে অনন্ত রহস্যের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাহার গৌরব বাড়িয়াছে। জগতটা যে পৃথিবীর প্রাঙ্গণ মাত্র নহে, পৃথিবী যে বিশ্বজগতের ধুলি কণার অধম, এই সংবাদেই আমাদের কল্পনা প্রসারিত হইয়া যায়। .....বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে তিনি যে আমাদের পক্ষে শূন্য স্বরূপ তাহা নহে, তিনিই আনন্দ। যাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা বড় বলিয়া জানি তাঁহাকেই উপাসনা করি। আমাদের সর্বোচ্চ উপাসনা তিনিই আকর্ষণ করেন। তিনি এত বড় যে কোথাও তাঁহার শেষ নাই। .....প্রকৃতি ভেদে কোন কোন স্বভাব ভক্ত লোক প্রচলিত মূর্তি দ্বারা ঈশ্বরের পূজাকে আত্মাবমাননা এবং পরমাত্মাবমাননা বলিয়া অভ্যাস বন্ধন ছেদন করিয়া আত্মার মধ্যে এবং বিশ্বের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করেন। মুহাম্মদ .....তাহার দৃষ্টান্ত। .....যাঁহারা মুক্ত ক্ষেত্রে বাস করেন তাঁহারা মাটিতে বসিয়াও আকাশের আলো পান। কিন্তু যাহারা জটিল প্রবৃত্তিকাল পরিবৃত হইয়া আছে তাহাদিগকে একেবারে পৃথিবীর দিক হইতে উড়িয়া বাহির হইয়া যাইতে হয়।"

"তাহা না করিয়া আমরা যদি আমাদেরই প্রবৃত্তি ও আমাদের আকৃতি দিয়া দেবতা গড়ি তবে তাহার মধ্যে মুক্তি কোন্ খানে? যদি তাহাকে স্নান করাই, খাওয়াই, মশারিতে শোয়াই, এমন কি তাহার জন্য যদি নটী নিযুক্ত করিয়া রাখি তবে তাহার ফল কি হয়? তবে নিজের প্রবৃত্তিকেই দেবতা বলিয়া পূজা করা হয়। আমাদের লোভ, আমাদের হিংসা, আমাদের

http://islaminonesite.wordpress.com

ক্ষুদ্রতাকে দেবতারূপে অমর রাখি। এই কারণেই দুস্য আপন দুস্যবৃত্তির সহায় বলিয়া জ্ঞান করে, মিথ্যা শপথকারী আদালতে জয়লাভের জন্য পশু মানত করে। এমন কি যে সকল অন্যায় অবিচার দুষ্কর্ম মানুষলোকে গর্হিত বলিয়া খ্যাত, দেবচরিত্রে তাহাও অনিন্দনীয় বলিয়া স্থান পায়।"

"আমাদের দেশের দেবতা কি মূর্তিতেই বদ্ধ যে রূপক ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে আমরা ভাবের স্বাধীনতা লাভ করিব। চার হাতকে যেন আমরা চারিদিকবর্তী কর্মশীলতা বলিয়া মনে করিলাম। কিন্তু পুরাণে, উপপুরাণে, যাত্রায়, কথকথায় তাহার জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, রাগ, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দৈন্য-দুর্বলতার বিচিত্র পাঠ ও পাঠান্তর হইতে মনকে মুক্তি করিব কেমন করিয়া? যত প্রকার কৌশলে মানুষের মনকে ভুরাইয়া একেবারে আটে ঘাটে বাঁধা যায় তাহার কোনটিরই ত্রুটি নেই। এবং এত প্রকার সুদৃঢ় স্থূল শৃংখলে অযতন বন্ধনকে (পৌত্তলিক) যদি তাঁহার নিগুণ ব্রহ্ম লাভের সোপান বলিয়া গণ্য করেন তবে মাছির পক্ষে মাকড়সার জালে পড়াই আকাশে উড়িবার উপায় মনে করা অসঙ্গত হইবে না।"

কেবল গদ্যে নয় –রবীন্দ্রনাথ কাব্যেও লিখেছেন ঃ

"মুগ্ধ ওরে স্বপ্ন ঘোরে,
যদি প্রাণের আসন কোণে
ধুলায় গড়া দেবতারে
লুকিয়ে রাখিস সংগোপনে।
চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিফল হবে
বাহিরে সে দাঁড়িয়ে রবে
কত না যুগ যুগান্তরে।"

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন ঃ

"রথযাত্রা সমারোহ মহাধূমধাম
ভক্তেরা লুটায়ে শির করিছে প্রণাম।
রথ ভাবে আমি দেব পথ ভাবে আমি
মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তরযামী।"

আমি মনে করি স্বামীজীদের পৌত্তলিকতার এই সদম্ভ দার্শনিক ব্যাখ্যার জওয়াবে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত উপরের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।

http://islaminonesite.wordpress.com

বইটির ২৮ পৃষ্ঠায় বেদানন্দ স্বামী জিজ্ঞেস করেছেন ঃ

"ইসলাম মত কয়টি মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্ভব করিয়াছে?"

আমি স্বামীজীর উপরোক্ত কথার জওয়াবে বলবো, অন্ধ আকাশের চন্দ্র, সূর্য ও লক্ষ কোটি গ্রহ নক্ষত্র দেখতে পায় না বলে কি আকাশের চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রগুলো মিথ্যা হয়ে যাবে? মুসলিম সমাজে লক্ষ লক্ষ সাধক ও মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটা সত্ত্বেও স্বামীজী যদি দেখতে না পান তাহলে তার অন্ধত্ব ঘোঁচাবে কে?

ওঁজয়িষ্ণু হিন্দুর ৯০ পৃষ্ঠায় স্বামী বেদানন্দ লিখেছেন ঃ

"হিন্দুই শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামে রক্তপাত করিয়া ভারতের রাষ্ট্র স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। .....মুসলমান জনতা ভারত রাষ্ট্রের জন্য অদ্যাপি কোন ক্ষেত্রে কিছু করে নাই। বরং রাষ্ট্রের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে এবং মৌখিক আনুগত্যের অন্তরালে তাহাদের বিভীষণ বাহিনীর সুলভ অন্তরঘাতী কার্যাবলী চলিতেছে, ভবিষ্যতেও চলিবে।

তাই যদি সত্য হয়, তাহলে আমি জোর গলায় বলবো অভিধানের পাতায় অসত্য বলে কোন কথাই নেই। যাঁদের তপ্ত শোনিতে ভারতের স্বাধীনতার অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হয়েছে; যাঁদের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও বলিদানই ভারতের চির উন্নত ললাট হতে ইংরেজের গোলামীর কলঙ্ক টিকাকে মুছে দিতে সক্ষম হয়েছে; দুই শতাব্দীর পরাধীনতার নাগপাশকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দিয়েছে যাঁদের কুরবানী, ভারতের স্বাধীনতার গগণচুম্বী প্রাসাদের প্রতিটি ইটে লেগে আছে যাঁদের রক্ত কণিকা ও তপ্ত শোনিত, স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই বীর মুসলিম নেতা ও সৈনকিদের কথা যদি বেদানন্দ স্বামী কলমের খোঁচায় উড়িয়ে দিতে চান তাহলে এই অকৃতজ্ঞ স্বামীজিকে ইতিহাস কি ক্ষমা করবে?

স্বামী বেদানন্দ যদি কানা না হন তাহলে তিনি যেমন স্বাধীনতার ইতিহাসের পাতায় একটা চোখে বাঘা যতীন, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, মিষ্টার গান্ধী, নেতাজী সুভাষ, পণ্ডিত নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, দাদাজী ও অরবিন্দকে দেখেছেন ঠিক তেমনি অন্য চোখে মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা মাহ্‌মুদুল হাসান, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, সীমান্ত গান্ধী গাফ্‌ফার খান, উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা হিফজুর রহমান, হাফেজ জামান, হাকিম আজমল খান, হাজী এমদাদুল্লাহ, তিতুমীর, স্যার আবদুর রহীম, ক্যাপ্টেন শাহনুওয়াজ, কর্ণেল আবদুর

http://islaminonesite.wordpress.com

রশীদ, আমীর খাঁ, কবি নজরুল ইসলাম ও শাহ্ আতাউল্লাহ বোখারীকে দেখতে পাবেন। সেই সঙ্গে স্বামীজীকে এও পরামর্শ দিচ্ছি; তিনি যেন একবার The Indian Peace Council এর প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত সুন্দর লাল মহাশয়ের নিম্নলিখিত বক্তব্যটি অনুধাবন করেন। পণ্ডিতজী বলেছেন ঃ

"একমাত্র কংগ্রেসই দেশকে স্বাধীন করে নাই। বরং স্বাধীনতার পশ্চাতে রয়েছে আলেম সমাজের বহু আত্মাহুতি ও অনেক বলিদান। কংগ্রেস আর কতদিনই বা সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে। স্বাধীনতার সংগ্রামে আলেমদের ইতিহাস ত্যাগ ও আত্মাহুতির ইতিহাস। আমি আজ হিন্দু ভাইদিগকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে এই দেশকে পরাধীনতা হতে মুক্ত করার জন্য মৌলবীগণ যত ত্যাগ স্বীকার করেছেন অন্য কোন সম্প্রদায় তত ত্যাগ স্বীকার করেন নাই।"

"১৮৫৭ সাল হতে কংগ্রেস কায়েম হওয়া পর্যন্ত এবং পরে কংগ্রেসের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা সহকারে তাহারা মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। যখন আমরা অহিংসার পথ অবলম্বন করিয়াছি তখন তাহারা আমাদের সহিত এক ছিলেন। (১৯৬৩ সালের মে মাসে মীরাট শহরে অনুষ্ঠিত সর্ব ভারতীয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের একবিংশতিতম সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ হইতে)।

স্বামীজী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ত্যাগ ও অবদানের কথা অস্বীকার করলেও ইতিহাস কোন দিন তা অস্বীকার করতে পারবে না। স্বামীজী মোহাম্মদ আলীর কথা ভুলে গেলেন কেমন করে তাই ভাবছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট অঙ্গ খেলাফত আন্দোলনের পুরোধা যে বীর সিংহ সগর্বে ইংরেজ প্রভুর তখতে লাথি মেরে বলেছিলেন ঃ "ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজ বিরোধিতা মোহাম্মদ আলীর জন্য বড় কথা নয়; মাতৃভূমির জন্য দরকার হলে বড় ভাই শওকত আলী ও আপন মায়ের বুকে গুলী চালাতে মোহাম্মদ আলী দ্বিধা করবে না।" যে মোহাম্মদ আলী ১৯৩০ সালে লন্ডন গোল টেবিল বৈঠকে ইংরেজ জজের সামনে নির্ভীক চিত্তে বলেছিলেন আমি চাই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা, অন্যথায় পরাধীন ভারতে আর ফিরে যাব না।" সত্যি তাঁকে আর ফিরে আসতে হয়নি। সেই আজাদী-পাগল মহাপুরুষের আকুল প্রাণের ব্যাকুল আহ্বান আল্লাহ কবুল করেছিলেন। সেই লন্ডনেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁর শবদেহ প্যালেষ্টাইনে

http://islaminonesite.wordpress.com

বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে ওমরের ছায়াতলে সমাহিত করা হয়। যে মোহাম্মদ আলীর বৃটিশ শাসনের নাগ্‌পাশ হতে স্বদেশকে মুক্ত করার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার অম্লান স্বাক্ষর বহন করছে তাঁর "কমরেড" ও "হামদর্দ" পত্রিকা, যাঁর তেজস্বী লেখনী আর গভীর স্বদেশ ও স্বাধীনতা প্রীতি সারা ভারতের আজাদীকামী মানুষকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল; যিনি স্পৃহার এক জ্বলন্ত প্রতীক হিসেবে স্মরণীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন– সেই মোহাম্মদ আলীর কথা নেহায়েত অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর কে অস্বীকার করতে পারে?

স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ– তেমনি মাল্টা বন্দী মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও তাঁর সহকর্মী মাওলানা হাসান মাদানী ও উবায়দুল্লাহ সিন্ধী প্রমুখ মুজাহিদ বাহিনীর ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। নেতাজী সুভাষ যেমন তাঁর সংগ্রামের জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে সুযোগরূপে গ্রহণ করেছিলেন– তেমনি তার ছাব্বিশ বছর পূর্বে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন মুসলিম বীর সেনানী মাওলানা মাহমুদুল হাসান। নেতাজী যেমন জার্মান ও জাপান প্রভৃতি বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে আজাদ হিন্দু ফৌজের দ্বারা ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বৃটিশ সরকারকে নাজেহাল করেছিলেন, ঠিক তেমনি মাহমুদুল হাসানও প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে আফ্‌গানিস্তান, তুরস্ক ও ইয়াগিস্তান প্রভৃতি দেশের সাহায্যে আফগানী মুজাহিদবৃন্দের সহায়তায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় গেরিলা যুদ্ধে ইংরেজকে নেস্ত-নাবুদ করে ছেড়েছিলেন। Our Indian Muslims-এর লেখক বাংলার ইংরেজ গভর্ণর উইলিয়ম হান্টার সাহেব বলেন, তারা অর্থাৎ মুসলিম মুজাহিদরা ইংরেজ সৈন্যকে কবর দিয়েছিল প্রতিটি বালুকায়।"

বারে বারে বিপুল সৈন্য সমাবেশে যখন বৃটিশ সরকার সেই গেরিলা যুদ্ধের বিজ্ঞ মুজাহিদ বাহিনীকে দমন করতে পারছিল না তখন বিশ্বের ঘনিয়ে আসা প্রথম মহাসমরের তাণ্ডব লীলার শুরু। আরব, বসরা, বলখ, কান্দাহার, বুখারা, সমরকন্দ, আফগানিস্তান ও তুর্কিস্তান প্রভৃতি স্থান হতে আকৃষ্ট হয়ে আসা বহু গুণমুগ্ধ শিষ্যদের সাহায্যে বিশেষতঃ দুর্ধর্ষ আফগানী ছাত্রদের সাহায্যে দেউবন্দে বসেই অতি সঙ্গোপনে নিজ ইঙ্গিতে যুদ্ধ

http://islaminonesite.wordpress.com

পরিচালনা করেছিলেন। সে সময় তাঁর একজন শিষ্য বেলুচিস্তানের 'বাসভিলা' নামক স্থানে বিদ্রোহের আগুন লাগিয়ে দিয়ে ইরাক যাত্রী সতেরো হাজার ইংরেজ সৈন্য ও সেনাপতি 'মিঃ টমসেন' কে সিন্ধু এলাকায় অবতরণ করিয়ে নির্মম মৃত্যুর মুখে পৌছে দেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চাকা হঠাৎ ঘুরে গিয়ে জার্মান ও জাপানের পরাজয়ে নেতাজীর সংগ্রাম যেমন মাঝপথে মারা যায়; আর তিনি রেঙ্গুন দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন, এমনি ভাবে প্রথম মহাসমরের বাতাস হঠাৎ বিরূপ হওয়ার ফলে তুর্কীর পরাজয়ে মাহমুদুল হাসানের সংগ্রামের ইমারত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। আর তিনি ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মক্কার ইংরেজ ভক্ত শাসক শরিফের হাতে বন্দী হন এবং তিন বৎসর দু'মাসের জন্য নির্বাসিত হন নিকটবর্তী মালটা নামক কুখ্যাত দ্বীপে। তথায় অসহনীয় দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে প্রিয় শিষ্য মাওলানা মাদানী সহ কোন ক্রমে প্রাণে বেঁচে ১৯২১ সালের ৮ই জুন তারিখে ভারতে ফিরে আসেন। পুণ্য স্মৃতি বুকে ধরে আজো বিদ্যমান উত্তর প্রদেশের মুজফ্ফরনগর জেলার ইতিহাস খ্যাত 'শ্যামলী'র রণক্ষেত্র। এই রণক্ষেত্রের মাটিতে রয়েছে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযানকারী পীর হাজী এমদাদুল্লাহ, মাওলানা কাসেম, মাওলানা গাংগুহী ও মহাত্মা হাফেজ জামানের তপ্ত কলিজার রক্ত কণিকা সমূহ।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য ১৯১৭ সালে মাল্টার নির্বাসন, ১৯২৩ সালে করাচীর জেল, নৈনীজেল প্রভৃতি বন্দীশালায় যাঁকে একের পর এক করে তের চৌদ্দবার– এমন কি বছরের পর বছর কারাজীবন যাপন করতে হয়েছে; যিনি ১৯৩৪ সালে এলাহাবাদ শহরে কংগ্রেস কর্তৃক আহুত জনসভায় মিষ্টার গান্ধী, পণ্ডিত পন্থ, নেহরু, সর্দার প্যাটেল, আজাদ, কিচলু ও রাজেন্দ্র প্রসাদের মত মানুষ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজের সশস্ত্র পুলিশ অফিসারের বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন –তিনি হলেন মাওলানা হাসান আহ্মদ মাদানী।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন একজন অন্যতম সেনাপতি। অনেক বিষয়ে তিনি মতিলাল নেহেরু, গান্ধী ও সি, আর, দাসকেও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। কংগ্রেসের নৈরাশ্য

http://islaminonesite.wordpress.com

নীতিকে তিনিই আশাবাদের আলোক মালায় রঞ্জিত করে তুলেছিলেন। মাওলানা আজাদের সম্পাদিত 'আল্‌হেলাল' ও 'আল্‌বালাগ্‌' ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক্‌ দিশারী। যে কংগ্রেস ইংরেজের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করার সংগ্রামে জিতেছিল, আবুল কালাম শুধু তার একজন প্রধানই ছিলেন না, তিনি তার নির্মাতাও ছিলেন। তিনি তার জন্য যে সীমাহীন সাধনা ও কঠোর নির্যাতন ভোগ করেছিলেন, তা ইতিহাস থেকে কোন দিন মুছতে পারে না।

১৯২১ সালে 'সাইমন কমিশনের' বিরুদ্ধে মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে লাহোরে এক বিরাট অধিবেশন হয়েছিল। সেই অধিবেশনে যে বীর সিংহ এক অভূতপূর্ব বক্তৃতা দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন তিনি হচ্ছেন শাহ আতাউল্লাহ বোখারী। সেদিন পণ্ডিতজী নিজে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন 'শাহজী আপনি তো হিন্দুস্থানের হৃদয়ের সুর।' সেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাইরীতে মন্তব্য করতে যেয়ে জনৈক পুলিশ অফিসার লিখেছিলেন "সেদিনকার লাহোরে এক তিলার্ধ পরিমাণ স্থান ইংরেজ সরকারের জন্য অবিশষ্ট ছিল না। কিন্তু সম্পূর্ণ লেকচারে এমন একটিও শব্দ ছিলনা, যা দ্বারা তাঁকে রাজ বিদ্রোহীর অভিযোগে গ্রেফতার করা যেতো।" ১৯২১ সালের ১০ই মার্চ তারিখে তাঁকে রাজ বিদ্রোহীর অপরাধে গ্রেফতার করে তিন বছর অমৃতসরের জেলে রাখা হয়। ১৯৩০ সালের ৩০শে আগস্ট তারিখে তিনি দিনাজপুরে বন্দী হয়ে আট মাস প্রেসিডেন্সী জেলে আটক থাকেন। ১৯৩৯ সালে আবার তিনি বন্দী হন। এভাবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিশ্বেশ্বর চৌধুরী উল্লেখ করে বলেছেন– "গণ আন্দোলনকারী গান্ধী কংগ্রেসেও মুসলিম সমাজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার প্রকৃত উপাসক, গণচেতনা সৃষ্টিকারী ততোধিক স্বাধীনতার পথ ও পাথেয়র দিশারী বিপ্লবী দলগুলির কর্মতৎপরতার মধ্যেও মুসলমানদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী তৎপরতায় মোপলাদের দান

http://islaminonesite.wordpress.com

যেমন অপরিসীম তেমনি প্রথম বিশ্ব সমরকালীন সময়ে বহির্ভারতে বিপ্লবী তৎপরতা হিসাবে অধ্যাপক বরকত উল্লাহের উদ্যোগে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্দী প্রমুখকে নিয়ে কাবুলে প্রথম অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠিত হয়েছিল। এ ছাড়া কৃষক শ্রমিক আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা বলিষ্ঠ ছিল। সর্বশেষ দ্বিতীয় মহাসমরে রাসবিহারী-সুভাষ নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীন সরকার ও আজাদ হিন্দু ফৌজে সেনানায়ক ও সৈনিকের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ছিল সমধিক। তাছাড়া বার্মা সীমান্ত পথে আক্রমণ শুরুর সাথে সাথে চট্টগ্রামে যে অস্থায়ী বিপ্লব সরকার গঠনের পরিকল্পনা হয়েছিল উহার প্রেসিডেন্ট পদে চিহ্নিত ছিলেন মাওলান মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী। এ ছাড়া বোম্বাই নৌ-বিদ্রোহে নেতৃত্ব পদেও ছিল মুসলমানেরাই। (টেকনাফ থেকে খাইবার ১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সত্যি কথা বলতে কি, ভারতের মুসলিম বীর সৈনিকদের ত্যাগ ও তিতিক্ষায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পূর্ণত্ব লাভ করেছে। মুসলমানদের ত্যাগ ও সংগ্রামের কথা বাদ দিলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাদ পড়ে যায়। কিন্তু স্বামী বেদানন্দ বেহায়া নির্লজ্জের মত এমন সব উক্তি করেছেন যার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে যাদের এতটুকুও জানাশুনা আছে, তাদের কাছে তিনি বেকুফ ও উপহাস্যই হয়েছেন।

জ্ঞান-পাপী স্বামী বেদানন্দ আরও জেনে রাখুন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানরাই রক্ত দিয়েছে সবচেয়ে বেশী। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রায় ত্রিশটি আন্দোলনের ইতিহাস পাওয়া যায়। অধিকাংশ আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও চাষী বিদ্রোহ, তাঁতী বিদ্রোহ ইত্যাদি নির্যাতিত হিন্দু-মুসলমান হাতে হাত মিলিয়ে শাসক ও শোষক ইংরেজের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয়, উচ্চ বর্ণের হিন্দু সমাজ ইংরেজ অপেক্ষাও কঠোর ও নির্মম মনোভাব নিয়ে এ সব গণ আন্দোলনকে দমনের ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। এক শ্রেণীর ভারতীয় হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের এই অদ্ভুত ও নজিরবিহনী বিশ্বাসঘাতকতা সত্যই বড় মর্মান্তিক। ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের শতাব্দীর পুঞ্জীভূত বেদনা যখন ১৮৫৭ সালে ব্যারাকপুরে

http://islaminonesite.wordpress.com

সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে সারা ভারতে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, সিপাহী নেতৃত্বে পরিচালিত হিন্দু-মুসলমানের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন স্বামীজীর স্বজাতি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, রাজা কমরকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত রায় হরচন্দ্র ঘোষ, বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি অনেক মহাশয়বৃন্দ। সে সময় শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের সভায় যে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ নমুনা হচ্ছে–

১। "এই সভা শ্রবণ করতঃ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে যে, এতদ্দেশীয় কয়েক দল পদাতিক সৈন্য গভর্ণমেন্টের বিরোধী হইয়া স্থানে স্থানে অত্যাচার করণে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহাদিগের এই অসচ্চরিত্র এবং ব্যবহারের জন্য সভার ঘৃণা ও ভয়।"

২। "এতদ্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী সিপাহীদিগের এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতি কোনরূপ সহায়তা না করাতে গভর্ণমেন্টের প্রতি তাহাদিগের অত্যন্ত ভক্তি হইয়াছে তজ্জন্য এই সভা অত্যন্ত পুলকিত এবং আনন্দিত হইয়াছেন। যেহেতু তাঁহারা একাল পর্যন্ত যে প্রকার রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এতদ্বারা তাহা আরো সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে।"

৩। "কতিপয় সিপাহীসেনা দুর্জনগণের কুপরামর্শে ও মিথ্যা ভয় প্রদর্শন দ্বারা যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছে তজ্জন্য এই সভা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন, যেহেতু ঐ ভ্রমের কোন কারণ নেই।'

৪। "এই বিদ্রোহ সময়ে দেশের শান্তিরক্ষা নিমিত্ত গভর্নমেন্টের প্রতি যদ্যপি কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিতে হয় তবে এই সভা এইরূপ অবধার্য্য করিতেছেন যে, মহারাণীর এতদ্দেশীয় সমুদয় প্রজা তজ্জন্য প্রাণপণে সাহায্য করা আপনাদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য বোধ করিবেন।"

৫। "এই সভার বিবরণ সর্বসাধারণের বিদিতার্থে এতদ্দেশীয় প্রচলিত ভাষায় অনুদিত হইয়া সর্বত্র প্রেরণ করা হয়।"

৬। "এই সভার বিবরণের এক অনুলিপি সভাপতি মহাশয় স্বাক্ষর

http://islaminonesite.wordpress.com

পূর্বক ভারতবর্ষের শ্রীযুত অনরবিল গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সমীপে প্রেরণ করা হয়।" (শ্রী বিনয় ঘোষ সংকলিত 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' পুস্তকের প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য)

ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় পরিচালিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় উক্ত খবর পরিবেশন করার পর ২০-০৬-১৮৫৭ তারিখের পত্রিকায় সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ঈশ্বরগুপ্ত যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন তা নিম্নে দিলাম–

"কয়েক দল অধার্মিক" অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হিতাহিত বিবেচনা বিহীন এতদ্দেশীয় সেনা অধার্মিকতা প্রকাশ পূর্বক রাজবিদ্রোহী হওয়াতে রাজ্যবাসী শান্ত স্বভাব অধন সাধন প্রজা মাত্রেই দিবারাত্র জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন, "এই দণ্ডেই হিন্দুস্থানে পূর্ববৎ শান্তি সংস্থাপিত হউক, রাজ্যের সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ হউক। হে বিঘ্ন হর! তুমি সমুদয় বিঘ্নহরা সকল উপদ্রব নিবারণ কর, প্রজা বৎসল সুধার্মিক সুবিচারক ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের জয় পতাকা চিরকাল সমভাবে উড্ডীন কর, –অত্যাচারী অপকারি দুর্জনদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর। যাহারা গোপনে গোপনে অথবা প্রকাশ্যরূপে এই বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া উল্লেখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছে তাহাদিগের দণ্ড দান কর। তাহারা অবিলম্বে আপনাপন অপরাধ বৃক্ষের ফল ভোগ করুক।

হে বঙ্গ দেশীয় মহাশয়গণ! আমরা আর অধিক কি নিবেদন করিব? সুযোগ্য পরম বিজ্ঞ 'অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ বিচারদক্ষ সর্বাধিক্য গভর্ণর জেনারেল' শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর তোমাদিগের অকপট প্রভুভক্তিতা, কৃতজ্ঞতা, সুশীলতা, মনের সফলতা, নির্মলতা এবং সচ্চরিত্রতার বিষয় বিশিষ্টরূপেই অবগত হইয়াছেন, কারণ বাঙ্গালী জাতি কাঙ্গালি অপেক্ষাও দুর্বল, অত্যন্ত ভীত, সাহসহীন, ভাত, মাছ খাইয়া শরীর ধারণ করে, অস্ত্রের নাম শুনিলেই কাঁপিতে থাকে, যাহারা আপনারা আপনারদিগের শরীর রক্ষা করিতে পারে না তাহারা কি আবার কস্মিনকালে অরিরভাব ধারণ করিয়া প্রবলতা প্রকাশ করিতে পারে? যে পর্যন্ত এ দেশে ইংরেজের প্রভুত্ব হইয়াছে,

http://islaminonesite.wordpress.com

সেই পর্যন্ত তোমরা প্রভুভক্তরূপে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছ, এই মহৎ গুণের প্রভাবে উপযুক্ত মত রাজানুগ্রহ ও প্রসাদ লাভ করিতেছ, এই কৃতজ্ঞতা ধর্মজন্য ধর্ম তোমাদিগের মঙ্গল করিবেন এবং লার্ড বাহাদুর অপ্রসন্ন হইয়া যথাযোগ্য কৃপা বিতরণে কখনই কৃপণতা করিবেন না তিনি প্রসন্ন হইয়া ভবিষ্যতে অধিক দয়া বিতরণ করিবেন।

সম্প্রতি অবোধ সেনারা বুদ্ধির বিকার বশতঃ যে কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছে, আমরা সেই কাণ্ডকে প্রকাণ্ড কাণ্ড বলি না, কেননা যেমন ব্রহ্মাণ্ডের নিকট ভাণ্ড সেই রূপ বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিশ জাতির নিকট এই কাণ্ড অতি ক্ষুদ্র।

যে অবোধ পর্বতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে সেই লোষ্ট্রাঘাতে আপনিই নিহত হয়। যদি তৃণের বা ঘাসের পর্বতকে চঞ্চল করিতে পারিত, যদি চটক পক্ষী চঞ্চু দ্বারা সমুদ্রকে শোষণ করিতে পারিত, যদি মেষশাবক শৃঙ্গাঘাতে পৃথিবীকে রসাতলে দিতে পারিত, তবে একদিন সিপাহীদিগের 'যুদ্ধনুষ্ঠানে আমরা ভয় করিতে পারিতাম ইহাতে ভয়ের বিষয় কি আছে? তবে দুঃখের বিষয় এই যে, যাহারা এত দীর্ঘকাল অধীনে থাকিয়া বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার পূর্বক সমুদয় সংগ্রামে অক্ষোভে প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছে। প্রতি সমুখ সমরে সাহসে জয়লাভ করে বিশ্বময় ব্রিটিশ বিক্রম বিস্তার করিয়াছে, সম্প্রতি হঠাৎ তাহাদিগের সেতাবের অন্যথা কেন হইল? এমন কুবুদ্ধি কেন ঘটিল? অবশ্যই তাহাতে কোন কারণ আছে, দুষ্ট লোকের দুষ্টাদেশেই এরূপ হইয়াছে। যাহা হউক এইক্ষণে কাজে কাজেই তাহাদিগকে যথাসাধ্য দণ্ড দিতে হইল। যদিও তাহারা অঙ্গ স্বরূপ, কিন্তু বিশেষ রোগে রুগ্ন ভঙ্গ অঙ্গ ছেদন না করিলে দেহরক্ষা হয় না, কোন কোন রোগে হাতখানা কাটিতে হয়, অতি পীড়াকর নড়াদন্ত ফেরিতে হয়, সুতরাং ইহা দিগের বিষয়েও সেইরূপ বিধি-বিধেয় হইতেছে।

"হে বাঙ্গালী মহাশয়রা! এ বিষয়ে আপনার দিগের যুদ্ধ করিতে হইবে না। অস্ত্র ধরিতে হইবে না। আপনারা সকলে একান্ত চিত্তে কেবল রাজপুরুষগণের মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যায়ন করুন। পরম পরাৎপর পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন সকল প্রকারে মহারাণীর জয় হউক, শুভ হউক লার্ড বাহাদুরের অভিলাষিত বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া সর্বোতভাবে সুখী হউন।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিদ্রোহানল এখনি নির্বান হউক। জগদীশ্বর আপন ইচ্ছায় বিদ্রোহীদিগকে শাসন করুন, যাহারা বিদ্রোহী হয় নাই, তাহাদিগের মঙ্গল করুন, কোন কালে যেন তাহাদিগের মনে রাজভক্তির ব্যতিক্রম না হয়। হে ভাই! আমারদিগের শরীরে বল নাই, মনে সাহস নাই, যুদ্ধ করিতে জানি না, অতএব প্রার্থনাই আমারদিগের দূর্গ, ভক্তি আমাদিগের অস্ত্র এবং নাম জপ আমাদিগের বল, এতদ্বারাই আমরা রাজ সাহায্য করিয়া কৃতকার্য হইব।"

"আমার দিগের কিছুমাত্র ভয় নাই, ব্রিটিশ অধীনে যেমন সুখে আছি চিরকাল সেইরূপ সুখেই থাকিব। সর্বশেষ এই প্রার্থনা করি গভর্ণর বাহাদুর নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্যের দূরাবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।"

"হে বাঙ্গালী সম্পাদকগণ! তোমাগিগের লেখনি যেন সুধা বর্ষণ করে, যেন বিষ বৃষ্টি করিয়া প্রলয়োৎপাদন না করে, সকলে রাজেশ্বরে কুশল প্রার্থনায় লেখনী চালনা কর।"

"শুধু গদ্যে নয়, পদ্য লিখেও ঈশ্বরগুপ্ত সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। নমুনা স্বরূপ তার একশত লাইনের একটি কবিতা থেকে ১২ লাইন মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করলাম–

'করি এই নিবেদন দীন দয়াময়।
বাঞ্ছাফল পূর্ণ কর হয়ে বাঞ্ছাময় ॥
চিরকাল হয় যেন ব্রিটিশের জয়।
ব্রিটিশের রাজলক্ষী স্থির যেন রয় ॥
এমন সুখের রাজ্য আর নাহি হয়।
শাস্ত্রমতে এই রাজ্য রাম রাজ্য কয় ॥'

– – –

'কর কর কর সবে অস্ত্র পরিহার।
কর কর কর মুখে স্বদোষ স্বীকার ॥
ধর ধর ধর এসে চরণে তাঁহার।
পূর্ববৎ অনুগত হও পুনর্বার ॥

http://islaminonesite.wordpress.com

অপার কৃপায় নিধি লার্ড দয়াময়।
করিবেন বিবেচনা উচিত যা হয় ॥

('সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র' পুস্তক ২২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

২২-০৬-১৮৫৭ তারিখের 'প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ইশ্বরগুপ্ত সিপাহী বিপ্লবের বিরুদ্ধে লিখেছেন ঃ

অবোধ অবাধ্য সিপাহী সেনা সম্প্রতি যে বিদ্রোহ ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে তজ্জন্য প্রজা-পুঞ্জের ভীত-চিত্ত হওয়া উচিত নহে। সাহসিকরূপে তাহারদিগের দমনার্থ সদুপায় করাই উচিত এবং উপস্থিত সময়ে রাজার শুভ স্বস্ত্যয়ন করাই কর্তব্য। পতঙ্গপুঞ্জ পক্ষ বিস্তার পূর্বক যে প্রকার প্রজ্জলিত অনল শিখায় পতিত হইয়া নিধন হয় দূরাচারি সিপাহীরাও সেইরূপ আপনারদিগের বিনাশকে আপনারাই আহ্বান করিয়াছে। বামন যে প্রকার গগণরাজির সুধাকরকে করতলস্থ করিবার অভিলাষ করে, মুর্খেরা সেইরূপ রাজ্যলাভে প্রত্যাশায় অস্ত্রাঘাতে ক্রমে ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। মহাবলা পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা যখন বাহুবলে এই সুদীর্ঘ ভারতবর্ষকে অধিকার করিয়াছেন, তাঁর দিগের প্রবল পরাক্রম যখন সর্বত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, এ দেশের নৃপতিগণ যখন পদানত হইয়া বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তখন সামান্য অবোধ অকৃতজ্ঞ সিপাহী সেনারা সেই প্রবল পরাক্রমের অপহ্নব করিবে? এতদুভয় যদিও সম্ভব হয়, তথাচ সিপাহীদিগের দ্বারা ব্রিটিশ জাতির রাজ্যভ্রষ্ট হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না।

ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যাহারদিগের রণবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন, গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, বেতন দিয়া সন্তোষ রাখিয়াছেন, পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, অধুনা তাহারাই গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হওয়াতে কেবল অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে, নরাধমেরা রাজকৃত উপকার সকল কি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে? কি পরিতাপ? যাহা হউক, এই আচরণের প্রতিফল আর বড় কালবিলম্ব নাই। .....পরন্তু উপস্থিত বিদ্রোহ নিবারণ নিম্মিত্ত যাহা করা কর্তব্য আমারদিগের বর্তমান সুবিবেচক গভর্নর জেনারেল বাহাদুর তাহা করিতেছেন, প্রথমতঃ বারাকপুরে অবাধ্য সিপাহী

http://islaminonesite.wordpress.com

সেনাদিগকে পদচ্যুত করিয়া দয়ার চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধুনা একেবারে সংহার মূর্তি ধারণ করিয়া বসিয়াছেন, অতএব এবার আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, লার্ড বাহাদুর দুরাত্মাদিগকে দমন করিয়া রাজ্য রক্ষা করতঃ যশোভাজন হউন। (সামাজিক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র ২৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ঈশ্বরগুপ্ত ০১-০১-১২৬৫ তারিখের সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

"আমরা যে পর্যন্ত সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় হইয়াছি, তদবধি একাল পর্যন্ত বাংলা ১২৬৪ সালের ন্যায় দুই বৎসরের ব্যাপার কখনই বর্ণনা করি নাই। .....যত প্রকারের বিদ্রোহ আছে তাহার মধ্যে রাজ বিদ্রোহই অতি ভয়ঙ্কর, বিশেষতঃ সৈন্য বিদ্রোহ, যাহারা রক্ষক তাহারাই নাশক হইলে তাহার অপেক্ষা অধিক বিপদ আর কি আছে?"

"কি পরিতাপঃ জগদীশ্বর কেন এমন করিলেন? যে সকল সিপাহী সৈন্য চিরকাল বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিয়াছে তাহারা হঠাৎ কেনই দুর্বুদ্ধি দোষে এতদ্রুপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। তাহাদের পূর্বেকার কৃতজ্ঞতা সূচক প্রভুভক্তি সাধারণ ব্যাপার নহে। ঐ সৈন্যেরা ব্রিটিশ শক্তির অধীন হইয়া এই ভারত ভূমিতে অস্ত্রধারণ পূর্বক বিপক্ষের বিরুদ্ধে নানা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রাজাজ্ঞায় অনায়াসেই কেউ আপন ভ্রাতার, কেউ আপন পিতার, কেউ আপন পুত্রের কেউ কেউ আপন জাতির মস্তক ছেদন করিয়াছে তাহাতে কিছু মাত্র দয়ামায়া প্রকাশ করে নাই সেই প্রভু ভক্ত সেনারাই আবার প্রভু বিনাশে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

শ্বেত সম্পাদকেরা অতি বিবেচনা পূর্বক কার্য সম্পাদন করুন, সাবধান হইয়া স্বঅভিপ্রায় ব্যক্ত করুন ইহাই প্রার্থনা (সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র ২৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তারপর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সিপাহী বিদ্রোহের সহিত ভারতের গোটা মুসলমি সমাজ যে জড়িত –একথা বলে তিনি ১৬-০৪-১২৬৪ তারিখের সম্পাদকীয়তে লিখেছেন ঃ

"অবোধ যবনেরা উপস্থিত বিদ্রোহ সময়ে গভর্ণমেন্টের সাহায্যার্থে কোন প্রকার সদানুষ্ঠান না করাতে তাহাদের রাজভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীতাচার

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রচার হইয়াছে এবং বিজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগের নিতান্ত অকৃতজ্ঞ জানিয়াছেন, দয়াবান সুবিচারক ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সকল ধর্মাবলম্বী প্রজাদিগের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া সুশৃঙ্খল নিয়ম সহকারে রাজকার্য নির্বাহ করিতেছেন, সকল প্রজাকেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সমান স্বাধীনতা দিয়েছেন, হিন্দু জাতির বিদ্যানুশীলন নিমিত্ত যেরূপ স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, যবনদিগের নিত্তিত সেইরূপ সদুপায় হইয়াছে। বিশেষতঃ বর্তমান প্রচলিত নিয়মানুসারে গভর্ণমেন্টের স্থাপিত সমুদয় বিদ্যালয়ে যবনেরা হিন্দুদিগের সহিত একত্রে উপবেশন পূর্বক অনুশীলন করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজকীয় বিশ্বাসযোগ্য উচ্চ আসনেও যবনেরা উপবেশন পূর্বক বিচারকার্য নির্বাহ করিতেছে। .....হায় কি অকৃতজ্ঞ। আমরা শ্রবণ করতঃ সাতিশয় অনুতাপিত হইলাম যে, অবোধ অকৃতজ্ঞ যবনেরাই দলবদ্ধ হইয়া কলিকাতার অদূরবর্তী আগড়পাড়া মিশনারী বিদ্যালয়ের প্রতি অত্যাচার প্রচার পূর্বক ইংরেজী পুস্তকাদি নষ্ট করণে উদ্যত হইয়াছিল। .....হায় দূরাত্মাদিগের কি সাহস! যবনদিগের অন্তঃকরণে কি কারণে গভর্ণমেন্টের প্রতি বিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা আমরা কিছু নিরূপণ করতে পারিলাম না।" (সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র ২৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

উক্ত পুস্তকে আরও দেখা যায় ১৭-০৩-১৪৬৫ তারিখের প্রভাকরের সম্পাদকীয়তে ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছেন ঃ

"আমরা অতিশয় আক্ষেপ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি, কয়েক দিবস অবধি ছাপরা, আরা, পাটনা, যতিহারী এবং নেপালাদি কয়েক স্থানে ডাক পুনর্বার বন্ধ হইয়াছে .....ইহাতেই স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে, উল্লেখিত সমুদয় স্থানে ডাক গমনাগমনের পথ বিদ্রোহী জালে আচ্ছাদিত হইয়াছে। নচেৎ এরূপ কেন হইবে? .....হে জগদীশ্বর! তুমি আর কতদিন এরূপ করিয়া আমাদিগকে কষ্ট প্রদান করিবে শীঘ্রই প্রসন্ন হও; প্রসন্ন হও। এই রাজ্য মধ্যে অচিরাৎ শান্তি সংস্থাপন করিয়া নিজ নামের মহিমা রক্ষা কর।"

"হে মহাবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ, আপনারা বেহার, ভোজপুর এবং তৎপার্শ্ববর্তী গঙ্গাদেবীর উভয় পরাস্থ প্রধান প্রধান স্থান সকল রক্ষার নিমিত্ত কি বিশেষ উপায় নির্ণয় করিতেছেন? আমরা এজন্য

http://islaminonesite.wordpress.com

উচ্চৈঃস্বরে আর কতই চিৎকার করিব, দুষ্ট দৌরাত্ম্যে অশেষ অত্যাচারে নিরাপরাধ দুর্বল প্রজাপুঞ্জের ধন প্রাণ, মান, সম্ভ্রম, জাতিকূল আর যে রক্ষা হয় না, যতদিন উক্ত প্রদেশ নিষ্কন্টক না হইবে ততদিন আমরা কোন মতেই এই বঙ্গদেশের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে শঙ্ক শূন্য হইতে পারিব না; অতএব উপযুক্ত সৈন্য ও অস্ত্রাদি প্রেরণ পূর্বক শত্রুকুল সমূলে নির্মূল করিয়া রাজ্যটিকে উপদ্রবের হস্ত হইতে রক্ষা করুন।"

মিঃ নিকলসনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সৈন্যদল যখন দিল্লী যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল তখন হিন্দু সমাজ কি যে আনন্দ লাভ করেছিল, ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল ঃ

'ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়।
মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয় ॥'

এলাবাহাবাদের যুদ্ধ শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখেছেন ঃ

"প্রয়াগেতে ছিল যত সিফায়ের দল।
একেবারে সকলেতে হল হতবল ॥
অধিকার করেছিল তরনীর সেতু।
হয়েছে তাদের তায় মরণের হেতু ॥
ঝুসিঘাটে ঘুসি খেয়ে মারা যায় প্রাণে।
ছারখার হইয়াছে অনলের বাণে ॥
এখন গোরার মুখে এইমাত্র কথা।
প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা যাও যথাতথা ॥'

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, মুসলমানরাই যে ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করতে যেয়ে 'আগরার যুদ্ধ' শীর্ষক কবিতায় ঈশরগুপ্ত তা স্বীকার করেছেন ঃ তিনি লিখেছেন ঃ

'আগরার নাগরায় মারিয়াছে কাঠি।
বীরাদাপে দাপিয়াছে কাঁপিয়াছে মাটি ॥
চক্রযোগে ষড়যন্ত্র করিয়াছে যারা।
ভয় পেয়ে কোনখানে ভাগিয়াছে তারা ॥

http://islaminonesite.wordpress.com

হেল্লা করে কেল্লা লুটে দিল্লীর ভিতরে।
জেল্লা মের বেড়াইত অহঙ্কার ভরে ॥
এখন সে কেল্লা কোথা হেল্লা কোথা আর?
জেল্লা মেরে কেবা দেয় দাড়ির বাহার?
ছেড়ে পাল্লা বলে আল্ল পড়েছি বিপাকে।
কাছে খোল্লা যত মোল্লা তোবা তাল্ল ডাকে ॥'

শুধু তাই নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিকদেরকে বৃটিশ যখন নির্মমভাবে হত্যা করতে শুরু করলো, তখন হিন্দু কবি আনন্দে আত্মহারা হয়ে লিখেছিলেন ঃ

'পুনর্বার হইয়াছে দিল্লী অধিকার।
'বাদ্‌শাহ-বেগম' দোঁহে ভোগে কারাগার ॥
অকারণে ক্রিয়াদোষে করে অত্যাচার।
মরিল দুজন তার প্রাণের কুমার ॥'

– – –

'একেবারে ঝাড়ে বংশে হল ছারখার।
শিশু সবে মারা যাবে বিহনে আহার ॥'

– – –

'বৃটিশের জয় জয় বল সবে ভাইরে।
এসো সবে নেচে কুঁদে বিভুগান গাইরে ॥'

মোট কথা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে হিন্দু মুসলিমের মিলিত সংগ্রাম এবং গোটা মুসলিম সমাজই যে এই সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য বৃটিশের নিকৃষ্ট দাসানুদাস ঈশ্বরগুপ্ত, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কমল কৃষ্ণ, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র রায় ও কালী প্রসন্ন সিংহের মত লক্ষ লক্ষ হিন্দু যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ইতিহাস থেকে তা পরিস্কার বুঝা গেল। তা সত্ত্বেও স্বামী বেদানন্দ যদি বলেন হিন্দুই শতাব্দী ব্যাপী সংগ্রাম করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করেছে, মুসলমানরা কিছুই

http://islaminonesite.wordpress.com

করেনি তাহলে মিথ্যাবাদীকে আর কি বলা যায়। তবে 'মুসলমানরা রাষ্ট্রের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছে এবং মেনে আনুগত্যের অন্তরালে তাদের বিভীষণ-বাহিনী সুলভ অন্তর্ঘাতী কার্যাবলী চলিতেছে, ভবিষ্যতেও চলিবে।'- বলে তিনি যে তর্জন গর্জন করেছেন, তার জওয়াবে আমি বলবো, হ্যাঁ মুসলমানরা রাষ্ট্রের না হলেও দেশ ভাগ করে নিয়ে হিন্দু সমাজের অনিষ্টই করেছে। কারণ হিমালয় হতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং দ্বারকা হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এই অখণ্ড ভারতের বুকে মুসলমানদের স্বার্থসংরক্ষণের সব প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে যখন হিন্দুরা 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম,' 'পতিত পাবন সীতারাম' –এর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, তখন জাগ্রত মুসলমানরা সে উদ্দেশ্য সফল হতে দেননি। যার ফলে অখণ্ড ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু এজন্য হিন্দু সমাজের অনুদার সাম্প্রদায়িক মনোভাবই যে দায়ী একথা স্বামীজীকে বুঝাবে কে?

মুসলমানরা ভারত রাষ্ট্রের অনিষ্ট চেষ্টা করেছে, বর্তমানে তাদের অন্তর্ঘাতী কার্যাবলী চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে এই অজুহাত দেখিয়ে নিরীহ ভারতীয় মুসলমানদের উপর প্রায় হাজার বার অত্যাচার, উৎপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে স্বামীজীরা যে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তা আজ কারো অবিদিত নেই। তজ্জন্য তারা সত্যিকার ভাবে প্রশংসা পাবারই যোগ্য। অতএব ঃ

জয় হিন্দু মানসিকতার জয়!
জয় স্বামীজীদের মিথ্যাবাদিতার জয়!!
জয় স্বামীজীদের পরশ্রীকাতরতার জয়!!!

সমাপ্ত

http://islaminonesite.wordpress.com

সাধু সাবধান

মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানী (রহ.)

http://islaminonesite.wordpress.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সাধু সাবধান

ওদের পরিচয়

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়। তারা মাথায় লম্বা চুল রাখে। মুখে দাড়ি গোঁফ রাখে। কারো কারো মাথায় বা দাড়িতে জটা দেখা যায়। তাদের পরনে ডোর কৌপীন, গায়ে খেলকা পিরান বা আলখেল্লা থাকে। তাদের কেউ কেউ ঝুলা, লাঠি, কিস্তি নিয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। তাদের মধ্যে যারা কিছুটা শিক্ষিত তারা একটু ভদ্রভাবে যেখানে সেখানে আস্তানা গেড়ে খুব সতর্কতার সাথে ফকিরি জাহির করার চেষ্টা করে থাকে। অনেকে আবার সৈয়দ মহিউদ্দীন আবুদল কাদের জিলানীর ভক্ত বলে, আবার কেউ কেউ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তির খলিফা বলে নিজেকে জাহির করে থাকে। তারা মাঝে মধ্যে দু'চারটা আজগুবি কথা বলে বা দু'চারটা কাণ্ড দেখিয়ে জনসাধারণকে অবাক করে দেয়। হাড়ি, মুচি, ডোম, চামার, হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সকলের সাথে মিশে সকলকে ওরা নিজেদের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে থাকে। ওদের কথাবার্তা শুনে ও কাণ্ডকারখানা দেখে অনেকে বলে– ওরা আল্লাহর ওলী, কেউ কেউ বলে ওদের মত মারফতি পীর আছে বলে আর মনে হয় না। কেউ কেউ বলে –হুঁ–হুঁ ভেদ আছে –ভেদ আছে। জটা পাওয়া কি মুখের কথা –জটা আল্লাহর খাস রহমত। কেউ কেউ বলে, মৌলবী মাওলানারা সব কচুরী পানার মত ভেসেই বেড়াচ্ছে, আসল বস্তু ঐ ফকিরদের কাছেই আছে। অবশ্য কুরআন হাদীস না জানা জাহেল লোকেরাই ওদের কাছে যায়।

সৈয়দ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) ও খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রহঃ) তারা প্রিয় নবীর খাস উম্মত ছিলেন। তাঁদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, লেবাস পোষাক ও ইবাদত বন্দেগী রসূলের (সাঃ) তরিক অনুযায়ী ছিল। তাঁদের মাথায় মেয়ে মানুষের মত লম্বা চুলও ছিল না, পরনে

http://islaminonesite.wordpress.com

ডোর কৌপীনও ছিল না। মাথায় বা দাড়িতে জটাও ছিল না, মাদক দ্রব্যও সেবন করতেন না। অথচ মাথায় লম্বা চুল রেখে, ডোর কৌপীন পরে মাদক দ্রব্য সেবন করে একদল ফকির আবদুল কাদের জিলানী ও খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তির (রহঃ) নাম ভাঙ্গিয়ে বাজিমাৎ করছে। এরূপ ধরনের এক ফকিরের জাঁক-জমকপূর্ণ আস্তানা থেকে ঘুরে এসে জনৈক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে বলেছিলেন, ফকির সাহেব লালন ফকিরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন কেন বুঝলাম না। আমি বললাম কি রকম? উত্তর পেলাম, ফকির সাহেব কথায় কথায় বললেন, হুঁ–হুঁ –বাবারা, রবি ঠাকুর কি বিশ্ব কবি এমনি হয়েছে, বাবা লালনের আশীর্বাদের জোরেই হয়েছে।

আমি বললাম কেন, আপনি অধ্যাপক মনসুর উদ্দীনের হারামনির সপ্তম খণ্ডের ভূমিকা পড়েননি? ভূমিকার ১৬ পৃষ্ঠায় লেখা আছে দেখবেন –"লালন শিষ্যদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ লালনের ফয়েজ লাভ করিয়াই বিশ্ব বিখ্যাত কবি রূপে পরিচিত হইয়াছেন।" ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, তাহলে উনি খাজা-শিষ্য নন –আসলে লালন শিষ্য?

আমার 'পীরতন্ত্রের আজব লীলায়' আমি লিখেছি, ওরা আসলে বাউল ফকির। নদীয়ার শান্তিপুরের কাছে বড়লগ্রামে মুনসী আবদুল্লাহ নামক এক লোক ছিল। শ্রীচৈতন্যের মত একজন বড় দার্শনিকের কাছে তর্কে পরাজিত হয়ে মুনশীজী শ্রীচৈতন্যের শ্রিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। শ্রীচৈতন্য তার নাম রেখেছিলেন 'যবন হরিদাস'। আশুতোষ দেব তাঁর বাংলা অভিধানে লিখেছেন, যবন হরিদাস একজন মুসলমান পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হইয়া যবন হরিদাস নামে খ্যাত হন। এই যবন হরিদাস চৈতন্যের কাছে শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে অশিক্ষিত মুসলমানদের মাঝে এসে প্রচার করতে লাগলো –হুঁ–হুঁ বাবারা ভেদ আছে –ভেদ আছে। মৌলবী মাওলানাদের কাছে আসল ভেদ নাই। আসল ভেদ আমাদের কাছে আছে। এই বলে যবন হরিদাস কিছু ভক্ত তৈরী করে ফেললো। এই ভক্তরাই হল বাউল ফকিরের দল।

যবন হরিদাসের প্রায় তিনশ বছর পর বাউলদের মাঝে লালন ফকিরের আবির্ভাব ঘটলো। লালন ফকির বাউল সমাজকে নতুন ছাঁচে গড়ে তুললেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

লালনের পরিচয়

লালন ফকির ১৭৭৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন আর ১৮৯০ সালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। লালন হিন্দু ছিলেন, না মুসলমান ছিলেন, তা পরিস্কার বুঝা যায় না। লালনকে নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই লালনকে হিন্দু বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীবসন্তকুমার পাল "মহাত্মা লালন শাহ" নামক যে লালনের জীবনী পুস্তক প্রকাশ করেছেন তাতে তিনি লালন ফকিরকে হিন্দু বলে দাবী করেছেন। লালনকে যাঁরা মুসলমান বলে দাবী করেছেন তাঁরা লালনকে একজন বেশারাহ অর্থাৎ কুরআন, হাদীস বিরোধী ফকির বলে উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকে একটি প্রবন্ধ বের হয়েছিল। এখন কথা হচ্ছে, লালন হিন্দুর ঘরে জন্মাক আর মুসলমানের ঘরে জন্মাক –তাতে কিছুই আসে যায় না। তবে তিনি একজন ইসলাম বিরোধী, শরীয়ত বিরোধী, বেশারাহ, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ফকির ছিলেন এবং হাজার হাজার মানুষকে যে গোমরাহীর পথে ঠেলে দিয়ে গেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বলাবাহুল্য, এই ফকিরের কবিত্ব প্রতিভা ছিল অসাধারণ। সুফী সাধনার মরমীয়া ধারা ও হিন্দু যোগ সাধনার প্রলেপ দিয়ে অসংখ্য গান তিনি রচনা করেছেন। তাঁর গানে ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে অনেক বাউল ফকির ও বাউল যোগী তৈরী হয়েছে। সে জন্য লালনকে বাউলদের সম্রাট বলা হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে যে সব ফকির মাথায় লম্বা চুল রেখে, ডোর কৌপীন পরে, আলখেল্লা গায়ে দিয়ে, ঘাড় গুঁজে, চোখ বন্ধ করে ফকিরি জাহির করে থাকে, ঐ ধরনের ফকির যারা আস্তানায় বসে বসে ঢোল-তবলা বাজিয়ে লালনের গান বা অনুরূপ গান গেয়ে গেয়ে আসরকে মাতিয়ে তোলে, তারা নিজেদেরকে যতই প্রকৃত সুফী, আল্লার ওলী, কামেল ফকির ও বুজর্গ পীর বলে দাবী করুক না কেন, তাদের গুরু ঠাকুর হলো আসলে ঐ বেশারাহ লালন ফকির।

বাউল যোগী দরবেশদের সাধনা

বাউল সুফী দরবেশ বা বাউল যোগীদের সাধনা বড় বিচিত্র সাধনা। এদের সাধন প্রণালী এত জঘন্য ঘৃণিত ও ন্যাক্কারজনক যে তা বর্ণনা করতে লজ্জা পাচ্ছি। পাঠকও পাঠ করতে ঘৃণাবোধ করবেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

অক্ষয় কুমার দত্তের লেখা "ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়" পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ –যা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ লালনের মৃত্যুর দু'বছর আগে "নিউ সংস্কৃত প্রেস" ৬নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হতে ছাপানো হয়েছিল, যা আমার কাছে মৌজুদ রয়েছে। উক্ত পুস্তকের ১৭২ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে, "বাউল ফকিররা নিজেদের সাধন ভজনের কথা যার তার কাছে প্রকাশ করে না। প্রত্যুত কহিয়া থাকে, আমাদিগের মত ও ভজন প্রকাশ করিলে প্রত্যবায় (ক্ষতি) আছে।

"আপন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা
আপনাকে হইবে আপনি সাবধান।"

অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন সাহেব তাঁর হারামনির ৭ম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন, "বাউল সাধনা মাতৃতান্ত্রিক সাধনা। এই মাতৃতান্ত্রিক সাধনার ভিত্তিমূল হইতেছে যাদু বিদ্যা। এবং যাদু বিদ্যা তখনই প্রসার লাভ করে যখন সমাজ অজ্ঞ ও কৃষি নির্ভর থাকে। যাদু শক্তি বা Magic power অসম্ভবকে সম্ভব করে। এই বিশ্বাসই যাদু বিদ্যার প্রচার বা প্রসারে সাহায্য করে।"

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "বাউল সাধনা যৌন ভিত্তিক ও যাদু বিশ্বাস ভিত্তিক সাধনা।" (হারামনি ৭ম খণ্ডের ভূমিকার ৬ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত তথ্য থেকে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে, বাউল যোগী দরবেশরা যাদু বা ম্যাজিক বিদ্যার তেলেস্‌মাতি খাটিয়ে মানুষকে বসে এনে তারপর তাদের কাছে সাধন প্রণালীর কথা ব্যক্ত করে থাকে। তবে তাদের একমাত্র সাধনাই হলো মানব দেহের সাধনা। মানব দেহের বাইরে তারা কোন কিছুরই অস্তিত্ব খুঁজে পায় না। আল্লাহ বলতে এই মানব দেহ; রসূল বলতে এই মানব দেহ, বেহেশ্‌ত দোজখ বলতে এই মানব দেহ; আসমান, জমিন, গ্রহ, নক্ষত্র, আগুন, পানি, ব্রহ্মা ও ভগবান বলতে এই মানব দেহ। মক্কা, মদীনা, পর্বত, সাগর, কাশী, বৃন্দাবন বলতে এই মানব দেহ। মানব দেহের পূজা অর্চনাই হলো ওদের কাছে আসল।

অক্ষয় বাবু তাই লিখেছেন ঃ

"সব কিছু মানব দেহের মধ্যেই আছে; অতএব নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র তাঁহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই।"

http://islaminonesite.wordpress.com

কারে বলবো কে করবে বা প্রত্যয়
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়।

● ● ●

যাহা আছে ভাণ্ডে
তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে

অতঃপর অক্ষয় বাবু লিখেছেন ঃ মানব দেহে বিরাজমান পরম আরাধ্যের প্রতি প্রেমানুষ্ঠান এই বাউল সূফী যোগীদের মূখ্য সাধন। নরনারীর প্রেমেতেই ঐ প্রেম পর্যাপ্ত হয়। অতএব স্ত্রীলোকের সাধনই ইহাদের প্রধান সাধন। ইহারা এক একটি স্ত্রীলোক লইয়া বাস করে এবং সেই স্ত্রীলোকের সাধনেই চিরদিন প্রবৃত্ত থাকে। ঐ সাধন পদ্ধতি অতীব গুহ্য ব্যাপার। উহা অন্যের জানিবার উপায় নাই। জানিলেও পুস্তকে সবিশেষ বিবরণ করা সঙ্গত নয়।.....

ঐ স্ত্রীলোক সাধনের অন্তর্গত 'চারি চন্দ্র ভেদ' নামে একটি ক্রিয়া আছে। লোকে ঐ ক্রিয়াকে অতি মাত্র বীভৎস ব্যাপার মনে করিতে পারে, কিন্তু বাউল দরবেশরা উহা পরম পবিত্র পুরুষার্থ সাধন বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা কহেন, লোকে ঐ চারটি চন্দ্রকে অর্থাৎ শোনিত, শুক্র, মল, মূত্র এই চারিটি দেহ নির্গত পদার্থকে পুনরায় দেহ মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে। ইহাদের ঘৃণা প্রবৃত্তি পরাভবের অন্যান্য লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাই, এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত মানুষের মাংস ভোজন ও শবের বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পরিধান করা প্রচলিত আছে।

যদিও ইহারা অনেক বিষয়ে সংগোপনে লোক বিরুদ্ধ কর্ম করিয়া থাকে, কিন্তু লোক সমাজে কিছু কিছু লোকাচার অবলম্বন করিয়াও চলে। এদের নীতিই হলো–

লোক মধ্যে লোকাচার
সদগুরু মধ্যে একাচার।

ইহারা ডোর কৌপীন ও বহির্বাস ধারণ করে এবং গাত্রে খেলকা, পিরান অথবা আলখেল্লা দিয়া থাকে। কেউ কেউ ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি লইয়া ভিক্ষা করিতেও যায়। ক্ষৌরী করে না, শ্মশ্রু ও ওষ্ঠ লোম প্রভৃতি সমুদয় কেশ রাখিয়া দেয় এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়া একটি ধম্মিল বাঁধিয়া রাখে। .....

http://islaminonesite.wordpress.com

ইহাদের ধর্ম সঙ্গীতের মধ্যে দেহতত্ব ও নারী সাধন সংক্রান্ত অনেকানেক নিগুঢ় ভাব সাঙ্কেতিক শব্দে সন্নিবেশিত থাকে। এই নিমিত্ত সহজে তাহার অর্থ বোধ হয় না। হইলেও প্রকাশ করিতে গেলে অশ্লীল হইয়া পড়ে। দুই চারটি গান এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে, যাঁহারা অনুভব করিয়া বুঝিতে পারেন বুঝিবেন ঃ

গান

সহজ মানুষ আলেকলতা
আলেকে বিরাজ করে
বাইরে খুঁজলে পাবি কোথা।
আলেকের প্রেমের কোলে
পেতেছে বাঁকানলে,
ত্রিবেনীর জল উজান চলে
বহিয়াছে সর্বদা।
আপনি চলে নলের পথে
সে নল কেউ নারে চিন্তে
জগতে করে চিন্তে
চিন্তামনি চিন্তা দাতা।
আলেক মানুষের রসে
সনাতন সদা ভাসে
বাউলে তোর লাগলো দিশে
যেতে নারবি সেথা।

● ● ●

মানব দেহ কলিকাতা কেতা চমৎকার।
তুলনা নাইকো তার।
খাসা লাল দীঘির পানি বড় মিষ্ট তা শুনি,
কেউ বলে ভাই লোনতা লাগে, ধর্মের হয় হানি
যে তার ভাব বুঝেছে সেই মজেছে মিটেছে মনের বিকার
মানব দেহ কলিকাতা কেতা চমৎকার।

● ● ●

দেল-দরিয়া খবর কররে মন।
তোর কোথায় মক্কা মদিনা
আর কোথায় বিন্দাবন,
কোথায় রে তোর গুরুর আসন।

http://islaminonesite.wordpress.com

যদি পদ্মা পাড়ি দিবি
তবে ঢাকা দেখতে পাবি
মুখ সুধাবাদ কররে অন্বেষণ।
আছে কলিতে কলিকাতা
তিন শহরে আঁটা
সাঁতার দে যায় রসিক যেজন।

● ● ●

হলো বিষম রাগের করণ করা
জেনে যোগ মাহাত্ম্য, রূপের তত্ত্ব, জানে কেবল রসিক যারা।
ফনি মুখে হস্ত দিয়ে, বসে আছে নির্ভয় হয়ে,
করি অমৃত পান গরল খেয়ে, হয়ে আছে জিয়ন্তে মরা।
রূপেতে রূপ নেহার করি, আছে রাগ দর্পণ করি,
হুতাশানকে শীতল করি
অনলে রেখেছে পারা। (ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় ১৭২-১৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ফকির সাহেবদের গানে যে লতা ও ত্রিবেণী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তার এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। অভিধান খুললে এর তাৎপর্য জানা যায় না। বাউল বা তান্ত্রিক সাহিত্যে লতার পরিভাষিক অর্থ হলো নারী জননাঙ্গ। (দেখুন শ্রীদেব প্রসাদ মুখ্যোপাধ্যায়ের লোকায়ত দর্শন ৩৯০ পৃষ্ঠা)

বাউল দরবেশদের মধ্যে লতাসিদ্ধি বলে একটি কাণ্ড আছে। উক্ত ফকিরদেরকে যখনই নামাজের কথা বলবেন, তখনই তারা উত্তর দিবে ইবলিস সব জায়গায় সিজদা করেছে আমরা সিজদা করবো কোথায়? এই কোথায় সিজদা করতে হবে –এই কথাটা আপনাকে কিন্তু আর সহজে তারা বলবে না। তবে শিষ্য হয়ে একান্ত ভক্ত যদি হতে পারেন তখন বলবে ইবলিস ঐ একটা জায়গা বাদ রেখেছে ওখানেই সিজদা করতে হবে –ওটা হলো ঐ 'লতা'। বাউল সুফীরা এভাবেই লতাসিদ্ধি পালন করে থাকে।

ত্রিবেণী বলতে বাউল ফকিররা মল, মূত্র, শুক্র এই তিনটি জিনিষকে বুঝিয়ে থাকে। বাউলদের মধ্যে কয়েকটি দল আছে। তার মধ্যে আপাপন্থী, বন্দেগী সাহেব ও সৎনামীরা বীভৎস কাণ্ড করে থাকে। এদের সম্বন্ধে অক্ষয় কুমার দত্ত লিখেছেন ঃ "ইহারা মৎস্য, মাংস ও মদ্য ব্যবহার করে না। ইহাদের মধ্যে অনেক সরল সজ্জন লোকও আছে। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর উদাসীনেরা এমন একরূপ বীভৎস ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে যে তাহাতেই

http://islaminonesite.wordpress.com

ইহাদের সমুদয় গুণ ও সমুদয় সাধনা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়েছে। সেটি চারি চন্দ্র ভেদের অনুরূপ। সেটি নিজ নিজ মল, মূত্র ও শুক্র মন্ত্রপূত করিয়া ভক্ষণ করা বই আর কিছুই নয়। ইহারই নাম ত্রিবেণী ক্রিয়া। ইহারা সেই অতীব গুহ্য ক্রিয়াকে পরম পুরুষার্থ সাধন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাহা গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ তাহার কয়েকটি লিখিত হইতেছে। শুক্রকে 'রস', মলকে 'অজর', মূত্রকে 'রাম রস', নাসিকার বাম রন্দ্রকে 'চন্দ্র', নাসিকার দক্ষিণ রন্ধ্রকে 'সূর্য', দক্ষিণ চক্ষুকে 'অর্দ্ধ', বাম চক্ষুকে 'উর্দ্ধ', মুখকে 'লঙ্কা', দন্তকে 'দশানন', লিঙ্গ ও গুহ্য দ্বারের মধ্যস্থলকে 'গোইন্দ্রিয়', লিঙ্গের যে দ্বার দিয়া শুক্র নির্গত হয় তাহাকে 'দশম দ্বার', প্রভৃতি।

উল্লিখিত তিন সম্প্রদায়ী ফকির ত্রিবেণী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। "আপনার মল, মূত্র ও শুক্র আপনি ভক্ষণ করে।" (ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় ২৬৬-২৬৭ পৃষ্ঠা)

বাউল ফকিরদের আর এক সেক্‌শনের নাম বীজমার্গী ফকির। এদের সম্পের্কে অক্ষয় বাবু লিখেছেন–

"ইহারা শুক্রকেই মূল বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করে। কেননা শুক্র হইতেই সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়।" .....

ইহারা একটি অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকে এবং তাহাতে অতীব গুহ্য প্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। শুক্ল পক্ষীয় চতুর্দশীতে ঐ চক্রের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কোন বীজমার্গী নিজ বাড়ীর স্ত্রীলোক বিশেষকে কোন বীজমার্গী বাউল দরবেশের সহিত সহবাস করাইয়া তাহা হইতে শুক্র নির্গত করাইয়া লয়। আবার ইহাও হইয়া থাকে, ইহাদের গৃহে কোন বাউল দরবেশের আগমন হইলে, আপনার স্ত্রী অথবা কন্যাকে তদীয় সেবায় নিযুক্ত করে, তাহারই সহিত সঙ্গম করাইয়া তদীয় শুক্র গ্রহণ করে ও সেই শুক্র একটি শিশিতে পুরিয়া রাখে ও অনুষ্ঠানের দিবস ঐ শুক্র আখড়ায় আনয়ন পূর্বক একটি উঁচু জায়গায় রাখিয়া দেয়। তারপর তাহাতে দুগ্ধ, মধু, ঘৃত ও দধি মিশ্রিত করিয়া পঞ্চামৃত প্রস্তুত করে। সেই পঞ্চামৃত মিষ্টান্নের সহিত মিশাইয়া মজলিসের সকলকে পরিবেশন করিয়া দেয়। ইহারা অনুষ্ঠানে জাতি বিচার পালন করে না। সকলের অন্ন সকলেই খাই। (ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় ২৭১-২৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

http://islaminonesite.wordpress.com

বাউল সাধু দরবেশদের শুক্র ও রক্ত খাওয়ার কথা নদীয়ার বিখ্যাত পুঁথি সাহিত্যিক মুনশী ফছিহুদ্দীন যিনি বাউল অধ্যুসিত এলাকার লোক, তিনি প্রায় একশত বছর পূর্বে তাঁর সুবিখ্যাত পুঁথির কেতাব 'মেফতাহুল ইসলামে' এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

বাউলিয়া সুফীদের শুন সমাচার
লিখিয়া শুনাই শুনে হও খবরদার।
শুক্রবারেতে রাতে একই ঘরেতে
গান-বাদ্য করে শুধু মেয়ে মরদেতে।
রাখিয়াছে সে ঘরে নাম প্রেমতাজা
সকলেতে পুলকিতে খাই প্রেমভাজা।
প্রেমভাজা করে বলে শুন মন দিয়া
রাখে সে ঘরের বিচে আটা বিছাইয়া।
প্রেমতত্ব শব্দ গেয়ে তাহারি মর্মেতে
অচেতন হইয়া যায় চাতুরি সাথে।
পাতিয়া লোভের ফাঁস সেই সময়েতে
ধরম নাশক পক্ষ ধরে সকলেতে।
মেয়ে মরদেতে সব সঙ্গম করিয়া
আটার মধ্যেতে দেয় বীর্য ফেলাইয়া
সেই সব আটা হইতে পিঠা বানাইয়া
সবে মিলে আনন্দেতে খায় ঘোর হইয়া।
প্রেমভাজা বলে বেহায়ারা এরি তরে
আয় আল্লাহ দিন দাও ইহা সবাকারে।
আর সে কখনো স্ত্রী অঙ্গেতে মুখ দিয়া
রিতুর শোনিত খায় চুষিয়া চুষিয়া।
আর **লাল সাধন** ইহাকে বলে তারা
শয়তানের কান কেটে দিন বেহায়ারা।
আর কেউ কেউ হস্ত মৈথুন করিয়া
বীর্য তার বারি করি করেতে করিয়া।
ভক্ষণ করিল শয়াতিনের তনয়,
আর **শ্বেত সাধন** ইহার তরে কয়।
আর কারু দৈবাৎ ঘুমের সময়
স্বপ্নদোষে কাপড়েতে বীর্য লেগে যায়।
পাইয়া তাহার চিন্য সেই জাগা ধুয়ে

http://islaminonesite.wordpress.com

মাহাখাদ্য তাহাকে জানিয়া লয় খেয়ে।
আর বলে মহাজনি পুঁজি এই চিজ
ইহাকে লোকসান করে সেই বেতমিজ।
মেছাল তাহার ফিরে এইমত দেয়
গোলা হতে কিছু ধান যদি পড়ে যায়।
সেই ধান কুড়াইয়া ঐ সে গোলায়
পুনর্বার রাখিতে সে হয় কিনা হয়।
তেমনি শরীর গোলা হতে বীর্য পৈল
কুড়াইয়া হেফাজতে ফিরে রাখা গেল।
আর এক খিটকাল শোন বিটকাল এমন
আজাজিল বুজি ভাবে না জানে কখন।
বাউলিয়াদের পীর শিষ্য বাটীতে
যাইলে শিষ্যরা করে মর্জদা এমতে।
যতদিন থাকে পীর শিষ্যর বাড়ীতে
নির্জন ঘর এক দিবে তার তরেতে।
আপন সামত্ত নারী পুষ্পরূপ লিয়া
পীরজীর চরনেতে সুঁপে দেয় গিয়া।
গুরুকে সুঁপিয়া জরু গরু থাকে দূরে
গুরু তার জরু লিয়া মাতেনও বিহারে।
গুরুকে না দিবে জরু কিসের কারণ
এই উপদেশ গুরু দেয় সর্বগুণ।
ঘরে আর বাহিরেতে কর একিমন
তবেতো পাইবে ওগো খোদা দরশন।
শিষ্য-গুরু পীরজীর মজে এ কথায়
আপন নারীকে দেয় পীরের সেবায়।
পীরজীর অসাক্ষাতে পীরের ভজন
করে সে কেমন করি শুনো দিয়া মন।
শুনো এবে ভাই ছারা বাউল ফকির তারা
করে তেল মাথার সময়
থোড়া তেল হাতে করে চক্ষু মুদে ধ্যান করে
বলে যাহা শুনোহে সবায়।
পীরজীর মস্তকেতে আর দিনু পায়ে হাতে

http://islaminonesite.wordpress.com

মাখাইনু সকল গায়েতে।
অনুগ্রহ পীর মোরে করো যেন সদা ভোরে
মহাদারে থাকি পা সেবিতে।
পীর ভজে এইভাবে আর গোমরাহান সবে
বলে **তেল সাধন** ইহারে
আর খানা খাইবার ওক্তে করে যে প্রকার
শুনো তার সারেত্তর ছারে।
যতেক তরকারী করে থোড়া থোড়া লিয়া তারে
আর থোড়া ভাত তারি সাথে
রেখে সব হাত পরে চক্ষু মুদে ধ্যান করে
বলে এই বহু মিনতিতে
লক্ষ লক্ষ মর্জাদাতে হাজার সম্মান মতে
করাইয়া পীরকে আহার
পরেতে নিজেতে খেতে বসে আর বলে তাতে
ওগো প্রভু ভরসা তোমার।
করে তারা এ মতন আর সে **অন্ন-সাধন**
এরি তরে বলে বেহায়ারা।
লাগিলে রাহেতে যেতে নির্বোধেরা প্রথমেতে
সকলেতে বলে এই ধারা
হে গুরু হাটিছি পথে তুমি সে রহিলে সাথে
মঞ্জেলেতে পৌছাবে আমায়।
চেতন স্বপনে তুমি কারে নাহি জানি আমি
ওগো বাবা তোমার ছেওয়ায়।
কত কব জায় জায় যে কাম করিবে তায়
স্মরণ গুরুকে প্রথমেতে
করে বাউলিয়া যারা আর এই বলে তারা
যাহা কিছু আছে মানুষেতে
আহারে মানুষ ধন মানুষ অমূল্য রতন
সব ধন আছে এই ধনে,
এতে কোন নাহি সন্ধ মানুষিতো নিত্তানন্দ
নিত্তানন্দ নাহি অন্য স্থানে।
যত কল্লা তত আল্লা এই কথা খোল্লা খোল্লা
বলে শয়তানের চেলাগণে

http://islaminonesite.wordpress.com

কেবল সে চড়িবারে গাধা ঘোড়া ইহাদের
বানায়েছে ইবলিশ শয়তানে ॥
(মেফ্‌তাহুল ইসলাম ৩৯-৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন সাহেবও তাঁর হারামণির সপ্তম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন, –"বাউলদের সাধনা তথা যোগী দরবেশদের সাধনা কামকে পরিশোধিত করা। কামের খেলা রতিক্রিয়ায় এবং রতির প্রকাশ বীর্যে। মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে এই বীর্য হইতেই মানুষের সৃষ্টি। কুরআন শরীফে পাই, 'খালাকাল ইনসানা মিন আলাক' অপবিত্র জল হইতে মানব সৃষ্টির পত্তন। বাউলদের সাধনা প্রধানতঃ এই অপবিত্র জলের সাধনা।" (হারামনি সপ্তম খণ্ডের ভূমিকা ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

আমার মনে হয় সে জন্যই বাউল ফকিররা বলে থাকে, 'বিস্‌মিল্লাহ' শব্দটি আসল কথা নয়। 'বিজ্‌মে আল্লাহ' শব্দটাই হচ্ছে আসল কথা। বীর্যের মধ্যে আল্লাহ। অতএব এক বিন্দু বীর্য নষ্ট করা চলবে না। যখনই যেভাবে নির্গত হোক না কেন তাকে খেতে হবে। সম্ভবতঃ সেজন্যই শ্বেত সাধন, প্রেম ভাজা ও পঞ্চামৃত খাওয়ার ব্যবস্থা বাউলদের মধ্যে রয়েছে। আর বীর্যের মধ্যে যখন আল্লাহ এবং বীর্য থেকেই যখন মানুষের সৃষ্টি তখন মানুষই হলো আল্লাহ। মানে যত কল্লা তত আল্লাহ। সেজন্যই বাউল ফকিররা বলে থাকে–

মন পাগলরে গুরু ভজনা
গুরু বিনে মুক্তি পাবিনা।
গুরু নামে আছে সুধা
যিনি গুরু তিনিই খোদা
মন পাগলরে গুরু ভজনা।

আমি আমার 'পীরতন্ত্রের আজব লীলা' পুস্তকে লিখেছি, "অমাবস্যার রাত্রিতে যে মেয়ের প্রথম ঋতুস্রাব দেখা দেয়। সেই রক্তমাখা ন্যাকড়া বাউল ফকিররা যোগাড় করে রাখে এবং একটু করে ছিঁড়ে পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি আগন্তকদেরকে খাইয়ে থাকে। এতে নাকি আগন্তুকদের চিত্ত-বিভ্রম ঘটে যায়।"

বাউল দরবেশরা যে রক্ত খায় এবং খাওয়ায়, এর প্রমাণ আপনারা ইতঃপূর্বে অক্ষয় কুমার দত্তের লেখা ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় পুস্তকের

http://islaminonesite.wordpress.com

১৭৪ পৃষ্ঠায় 'চারি চন্দ্র ভেদ' ক্রিয়ায় ও মুনশী ফসিহুদ্দীনের মেফতাহুল ইসলামে 'লালন সাধন ক্রিয়ায়' পেয়েছেন। অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন সাহেব লিখেছেন, –"নারী ও ভূমি একই জাতীয়; অম্বুবাচীতে জমি সিক্ত হইয়া যায়। নারীরও দেহে মাসে মাসে অম্বুবাচীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই কথাই বাউলেরা ইঙ্গিত করিয়াছেন 'বিনা মেঘে বরিষণ'। বরিষণ হইতেই স্রোত পয়দা হয়। এই স্রোত ধারা যতদিন চালু থাকে ততদিন নারী বাউল সাধনার পক্ষে অপরিহার্য।" (হারামনির সপ্তম খণ্ডের ভূমিকা ১৫ পৃষ্ঠা)

উক্ত পৃষ্ঠার টীকায় তিনি উল্লেখ করেছেন– "নারীর যৌন জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত রক্ত, ঋতু রজ। প্রাচীন কালের কল্পনা অনুসারে নারীর উৎপাদিকা শক্তির মূলে রয়েছে এই ঋতু রজই।" (শ্রীদেব প্রসাদ মুখোপাধ্যায় লোকায়ত দর্শন ৩৩৫ পৃষ্ঠা)

"চাতক থাকে মেঘের আশায় অন্য বারি খায়না সে' –লালনের এই গানে সাধকের বিনা মেঘের বরিষণের আশায় অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। এই বরিষণ নারীর মাসিক রক্ত প্রবাহ ধারা।" (হারামনির ৭ম খণ্ডের ভূমিকা ১৬ পৃষ্ঠা)

মনসুরউদ্দীন সাহেব আরও লিখেছেন, –"বাউলদের সাধনার মর্মবাণী যৌন-সাধনা ভিত্তিক। মনে হয় সুদূর অতীতের ম্যাজিক যাদু বিশ্বাস ইহার মধ্যে কার্যকরী রহিয়াছে।"

তাহারা বিশ্বাস করে ঈশ্বররূপে মীন প্রবাহিত হচ্ছে রজধারায়। নারীর রজ ব্যতিরেকে সেই মীন ধরার কোন উপায় নাই। লালন ফকির তাই বলেন–

যারে ধ্যানে পায়না মহামুনি
আছে সেই অচিন মানুষ মীনরূপ ধরিয়ে পানি।
আজব রঙের মীন বটে সে
সাত সমুদ্র জুড়ে আছে
সবার হাতের কাছে
চিনতে পারে কোন ধনী।

কররে সমুদ্র নির্ণয়
কোন যুগে তার কোন ধারা বয়

http://islaminonesite.wordpress.com

যোগ চিনে ডুবলে তাতে
মীনকে ধরা যায় আপনি।

যোগ বুঝে মীন পরে ধরা
জানতে পাল্লে নদীর ধারা
সিরাজ সাঁই বলছে খাড়া
লালন সে ঘাটে খায় চুবানি।

সদায় সে নিরঞ্জন নীরে ভাসে
যে জানে সে নীরের খবর নীর খাটায় তারে।
খুঁজলে পায় অনায়াসে।

বিনা মেঘে নীর বরিষণ
করিতে হয় তার অন্বেষণ
যাতে হলো ডিম্বের গঠন
থাকিয়ে আবিম্ব শুম্ভোবাসে।

যথা নীরের হয় উৎপত্তি
সেই আবেশে জন্মে শক্তি
মিলন হলো উভয় রতি
ভাসলে যখন নরাকারে এসে।

নীরে নিরঞ্জন অবতার
নীরেতে সব করবে সংহার
সিরাজ সাঁই তাই কয় বারে বার
দেখরে লালন আত্মতত্ত্ব-বেশ।

(হারামনির ৭ম খণ্ডের ভূমিকা ২০-২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

"বিবাহ আইন প্রচলনের পূর্বে বৈদিক জীবনে আমরা দেখিতে পাই যে, সন্তানবতী এবং স্বামী সোহাগী স্ত্রীকে অন্য একজন তাহাদের সম্মুখেই আসঙ্গ লিপ্সার আহ্বানে ব্যর্থকাম হন নাই। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের সভ্য-অসভ্য জাতির ইতিবৃত্ত দেখিলে এবং তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষের আদিম প্রবৃত্তি পূজা পাইয়া আসিয়াছে। বাউলদের সাধনা আদিম মানুষের সাধনা, বহু প্রাচীন কালের রীতিনীতি বহন করিয়া আনিয়াছে। (হারামনি ৭ম খণ্ডের ভূমিকা ৭ পৃষ্ঠা)

http://islaminonesite.wordpress.com

ন্যাড়া

বাউল ফকিরদের একটি শাখার নাম 'ন্যাড়া'। এ ন্যাড়া ফকিরদের নাম ন্যাড়া কিন্তু এরাও মাথায় লম্বা চুল, মুখে দাড়ি গোঁফ, পরণে ডোর কৌপীন, গায়ে খেলকা-পিরহান ও আলখেল্লা গায়ে দিয়ে থাকে। অক্ষয় বাবু এদের সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

"বাউল ফকিরদের ন্যায় এ সম্প্রদায়েরও প্রকৃতি নারী অর্থাৎ সাধনই প্রধান ভজন। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা বাহুদেশে তাম্র অথবা লৌহের একটা কড়া রাখে। ইহারা ডোর কৌপীন ও বহির্বাস ব্যবহার করে। ইহারা মালা ধারণ করিয়া থাকে। ঐ মালার মধ্যে স্ফটিক, পলা ও শঙ্খাদির মালা সন্নিবেশিত করিতে দেখা যায়।

ইহারা ক্ষৌরী হয় না, শ্মশ্রু ও ওষ্ঠলোম প্রভৃতি রাখিয়া দেয় এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়া বাঁধিয়া রাখে। শরীরে যথেষ্ট তৈল মর্দন করে, গাত্রে খেলকা পিরান অথবা আলখেল্লা দেয় এবং ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি সঙ্গে লইয়া বেড়ায়।

ইহাদের মধ্যে কেউ কেউ নানা বর্ণের চীর সমূহ (অর্থাৎ কাপড়ের টুকরো সমূহ) একত্র সংযুক্ত করিয়া আলখেল্লা প্রস্তুত করে এবং ঐ আলখেল্লা ও মস্তকে টুপি দিয়া ইতঃস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। ঐ আলখেল্লার নাম চিন্তা-কন্থা। শুনিতে পাই নারী সাধন সংক্রান্ত কোন কোন গুহ্য পদার্থে উহার কোন কোন চীর রঞ্জিত করা হয়। উহার এমন মহিমা যে, বাবাজীদের সঙ্গে কথা-বার্তা হইয়া থাকে। (ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় ১৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কর্তাভজা

অক্ষয় কুমার দত্ত 'কর্তাভজা' নামক আর একটি বাউল শাখার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, –এক উদাসীন এই কর্তাভজা দলের প্রবর্তক। তাঁহার নাম আউলে চাঁদ। .....তিনি কৌপীন ধারণ পূর্বক খেল্কা ও কন্থা গাত্রে দিয়া পর্যটন করিতেন। লোকদিগকে বাংলা ভাষায় উপদেশ দিতেন। হিন্দু, মুসলমান, ম্লেচ্ছ সকলকেই সমান জ্ঞান করিতেন এবং জাত্যাভিমান পরিহার পূর্বক সকলেরই অন্ন ভোজন করিতেন। আউলে চাঁদের হিন্দু, মুসলমান ম্লেচ্ছ নির্বিশেষে অনেক শিষ্য ছিল। তাহারা কর্তাভজা নামে খ্যাত।

http://islaminonesite.wordpress.com

কর্তাভজাদিগের এরূপ বিশ্বাস আছে যে, আউলে চাঁদ অনেকানেক অতাদ্ভুত অলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করিয়া যান। এই সম্প্রদায়ের গুরুরা শিষ্যকে প্রথমে 'গুরুসত্য' এই মন্ত্র প্রদান করেন। পরে যখন তাহাদের প্রগাঢ়তর গুরু-ভক্তি উৎপন্ন হইয়া জ্ঞান পরিপক্ক হয়, তখন ষোল আনা মন্ত্র উপদেশ করেন; যথা ঃ

"কর্তা আউলে মহা প্রভু
আমি তোমার সুখে চলি ফিরি
তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি
আমি তোমার সঙ্গে আছি
দোহাই মহাপ্রভু।"

এই সম্প্রদায় গোপনে গোপনে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কর্তার অনুচরেরা গৃহস্বামীদের অজ্ঞাতসারেও অবলীলাক্রমে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। ইহাদের সাম্প্রদায়িক কোন গ্রন্থ নাই। তবে বিস্তর গান আছে। দুই একটি গান উদ্ধৃত করা গেল।

১

তুফান আসতেছে কস্যে, জলে জল যাবে মিশে
মাঝি হাল ধর কস্যে
আর যাঁহা নৌকা তাঁহা তুফান, নৌকা রাখ কি কারণ
ওরে মাঝি দাঁড়িয়া শোন।
মাঝি সত্য বাদাম লও, ধীরে ধীরে বাও,
কেন তুফান পানে চাও? হাল ধরেছে নিরঞ্জন ॥

২

ও কে ডাঙ্গায় তরি যায় বেয়ে; কোন রসিক নেয়ে,
আছে দাঁড়ী মাঝী দশজনা, ছয়জনা তার গুণ টানা,
সে কে তা জেনেও জানিলে না।
আনন্দেতে যাচ্ছে বেয়ে, যত অনুরাগী সারে গেয়ে,
এ কোন রসিক নেয়ে;
আছে ডিঙ্গা ভরা বস্তু ধন, বস্যে প্রেমের মহাজন
তার চৌকী পঞ্চজন ॥

http://islaminonesite.wordpress.com

৩

ক্ষ্যাপা এই বেলা তোর মনের মানুষ চিনে ভজন কর।
যখন পালাবে সে রসের মানুষ
পড়িয়া রবে শুধু ধর।
(ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়)

সহজিয়া

বাউল ফকিরদের আর এক শাখার নাম 'সহজিয়া'। এই সহজিয়া ফকিরদের সম্পর্কে অক্ষয় বাবু লিখেছেন ঃ

"সহজিয়া ফকিরদের মত অতি নিগুঢ় ও অতীব উদার। ইহাদের মতে গুরুই হলো পূজনীয়। ইহাদের গুরু দুই প্রকার। দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা গুরু। তন্মধ্যে শিক্ষা গুরুই প্রধান।"

নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয় এই পঞ্চবিধ আশ্রয় ভজন প্রণালীর অন্তর্গত। সহজিয়া দরবেশদের মতানুসারে শেষ দুইটি আশ্রয় অর্থাৎ প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়ই সর্বপ্রধান। ঐ রস নায়ক নায়িকার সম্ভোগ স্বরূপ। উহা দুই প্রকার, স্বকীয় ও পরকীয়। সহজ সাধনে পরকীয় রসই শ্রেষ্ঠ। গুরু ও শিষ্য উভয়ে প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া রসলীলা করিতে প্রবৃত্ত থাকেন। ইহাকেই সহজ সাধন কহে। এক গুরুর অনেক শিষ্যা ও এক শিষ্যার অনেক শিক্ষা গুরু হওয়া সম্ভব। অতএব সহজিয়া ফকিরের প্রত্যেক পুরুষেই অনেক নারীর সহিত ও প্রত্যেক নারী অনেক পুরুষের সহিত প্রেমলীলা করতঃ পরিত্রাণ পাইতে পারেন। এক এক গুরু অনেকানেক নিত্য সিদ্ধ সখী স্বরূপ কামিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অশেষ বিধ সুখ সম্ভোগে প্রীত হইয়া থাকেন।

গুরু করবো শত শত মন্ত্র করবো সার
যার সঙ্গে মন মিলবে দায় দিব তার।

এই শ্লোকটির পাঠান্তর ও শুনিতে পাওয়া যায়। যথা ঃ

"গুরু করবো শত শত মন্ত্র করবো সার
মনের আঁধার যে ঘুচাবে দায় দিব তার।"
(ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় পুস্তক ১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

http://islaminonesite.wordpress.com

দরবেশ

বাউল ফকিরদের আর এক শাখার নাম দরবেশ। এই দরবেশদের সম্পর্কে অক্ষয় বাবু লিখেছেন ঃ

ইহারা নামে দরবেশ হইলেও প্রকৃতি সহবাসে (অর্থাৎ নারী সহবাসে) নিবৃত্ত নহে। প্রত্যেকে এক একটি প্রকৃতি রাখে বাউল ও ন্যাড়াদের মতানুরূপ প্রণালী-বিশেষ অবলম্বন করিয়া সান করিযা থাকে। ইহার গাত্রে একটি আলখেল্লা অর্থাৎ দীর্ঘকার পিরান দেয় এবং ডোর ও কৌপীন ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের অন্যান্য বেশ ও কেশ বিন্যাস বাউল ও ন্যাড়াদিগের অনুরূপ। ইহাদিগের মতানুসারে লোকাচার অবলম্বন করা তাদৃশ আবশ্যক নহে। অথচ অনেককে গলদেশে মালা ধারণ করিতে এবং ঐ মালার মধ্যে স্ফটিকাদি সন্নিবেশিত করিতে দেখা যায়। কেউ কেউ কাষ্ঠের মালা একেবারেই পরিত্যাগ করে। বজ্রমালা, স্ফটিক, প্রবাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া মালা প্রস্তুত করে এবং সেই মালা ধারণ পূর্বক ইতস্ততঃ পর্যটন করিয়া থাকে। ঐ মালার নাম তস্‌বিহ মালা। ন্যাড়া ও বাউলেরাও কেউ কেউ ঐ তস্‌বি মালা সঙ্গে রাখে এবং মধ্যে মধ্যে দুগ্ধ মধ্যে অভিষিক্ত করিয়া থাকে। দরবেশরা সব সময় 'দীন-দরদী' নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। দরবেশরা বলিয়া থাকে–

"কিয়া হিন্দু কিয়া মুসলমান
মিলজুলকে কর সাঁইজীকা কাম।"

(ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় ১৮১-১৮২ পৃষ্ঠা)

সাঁই

বাউলদের আর এক শাখার নাম 'সাঁই'। এই সাঁই ফকিরদের সম্পর্কে অক্ষয় বাবু লিখেছেন ঃ

সাঁই ও দরবেশ প্রায় একরূপ। পার্থক্য এই যে, সাঁইয়েরা কখনো কখনো লোক বিরুদ্ধ কর্ম করিতেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহারা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই অন্ন ভোজন করে। ইহাদের ধর্ম হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম মিশ্রিত। ইহারা খাক শাফার অর্থাৎ মক্কার মাটির মালা জপ করে। ঐ মালা মক্কা হইতে আইসে। ঐ মালার মধ্যে একটি বড় মালা আছে, তাহাকে সোলেমানি মালা বলে। এই জপের মালাতে একশত একটি দানা

http://islaminonesite.wordpress.com

ও তন্মধ্যে দুইটি সাদা বেলোয়ারি ও দুইটি আকিকল্‌বরের অর্থাৎ বহুমূল্য লাল রঙ্গের পাথরের দানা আছে। ইহারা 'রশিদ সত্য' –এই নাম জপ করিয়া থাকে। গলদেশে জৈতুন কাষ্ঠের মালা ধারণ করে। বাম হস্তে তামার ও লোহার বালা এবং দক্ষিণ হস্তে ২/৩টা করিয়া হকিকের মালা ও খাক্ক শাফার দানা ধারণ করে। কেহ প্রকৃতি (নারী) রাখে, কেহ রাখে না। সাঁই ফকির ও দরবেশরা নিম্নের বচনটি নিয়মিত ভাবে পাঠ করিয়া থাকে।

"আপন দেল কেতাবসে ঢুড়ে লে
মুরশিদ আমার কোনখানে বিরাজে রে।
মুরশিদ আমার কোন শিয়রে জাগেরে।"
.....ইত্যাদি। (ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় ১৮২ পৃষ্ঠা)

আমি আগেই বলেছি বাউলদের সাধনা বড় বিচিত্র সাধনা। বাউলদের সাধনা বড় ন্যাক্কারজনক সাধনা। মানুষের দেহ ছাড়া কোন কিছুই তারা বোঝে না। মানব দেহকে বিশ্ব চরাচরের একটি ক্ষুদ্র ও উন্নত সংস্করণ বলে তারা মনে করে। মানব দেহের প্রতিটি জিনিষ তাদের কাছে মহা পবিত্র। মানব দেহ জরিপ করা ও তার পূজা অর্চনা করাই হলো তাদের ধর্ম। তাদের যাবতীয় গান দেহকে নিয়েই রচিত। সেজন্য বাউল গানকে দেহতত্ত্ব গান বলা হয়।

অধ্যাপক –মনসুরউদ্দীন সাহেব বলেছেন ঃ

"পাক ভারতে তো হিন্দু প্রাচীন তীর্থ স্থান নানা জায়গায় ছড়াইয়া রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ কামরূপ, কামাখ্যা, হিংলাজ প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। শেখ আবদুল লতিফ ভিটায়ী বহু হিন্দু যোগীদের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। বুল্লেল শাহ, লালন শাহ, মাধো হোসেন শাহ প্রভৃতির সঙ্গে হিন্দু যোগীদের দেখা-সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ ছিল। হিন্দু সাধন পদ্ধতি তাঁহারা সম্ভবতঃ আংশিক বা পুরাপুরি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।" (হারামনি ৭ম খণ্ডের ১১ পৃষ্ঠা)

অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন সাহেব আরও বলেছেন, –"হিন্দু মুসলমান ধর্মমতের জগাখিচুড়ী লালন শাহের গানে পাওয়া যায়। মনসুর হাল্লাজ, আবু সাঈদ ইবনু আবুল খায়ের প্রমুখ সুফী ও কবিদের রচনার মধ্যে এমন বাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাহা শরীয়তে ইসলামের ঘোর বিরোধী। লালন

http://islaminonesite.wordpress.com

শাহের সঙ্গীতের মধ্যে অনুরূপভাবে শরীয়তের বরখেলাফ উক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় –একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে। (হারামনি ৭ম খণ্ড (ঘ) পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

যদিও যবন হরিদাস থেকে বাউল দলের সৃষ্টি, কিন্তু লালন ফকির বাউলদের মাঝে বিরাট এক আলোড়ন ও জাগরণ এনে দিয়েছে। হিন্দু বাউল যোগী ও মারফতী বাউল সুফী ঐ একই উৎস থেকে তৈরী হয়েছে। নদীয়া থেকে বিস্ফোরণ ঘটে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

লালন আল্লাহকে ও আল্লাহর সৃষ্ট মানুষকে একাকার করে দিয়েছে। লালনের গানে আছে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ; লালনের গানে আছে নর-নারীর অবাধ মিলনের প্রেরণা, লালনের গানে আছে গুপ্ত যৌন প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার গভীর উৎসাহ; লালনের গানে আছে নাপাক দ্রব্য ভক্ষণ করার প্রেরণা; লালনের গানে আছে তৌহিদ বিরোধী কালাম। লালনের গানে আছে শরীয়ত বিরোধী কথা। লালন আজ নাই, কিন্তু লালনের হাজার হাজার রূহানী সন্তান বিরাজ করছে। তার ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণার জালে ফেলে হাজার হাজার মানুষকে সে বিভ্রান্ত করে গেছে। বাউলিয়া, সহজিয়া, ন্যাড়া, সাঁই, দরবেশ, বন্দেগী সাহেব ও সৎনামীর দল আজ সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে সেখানে ছোট বড় খানকাও গড়ে উঠেছে। কুরআন হাদীস না জানা নিরীহ মানুষকে তারা টোপ গিলাবার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

আমি বাংলাদেশের প্রতিটি ভাই-ভগ্নীদের কাছে আরজ করছি; যে কোন জায়গায়, যে কোন আস্তানা বা খানকায় ফকির দরবেশ দেখলেই আপনারা ভাববেন না যে, সে আল্লাহর ওলী বা কামেল বুজূর্গ। তাকে আপনারা পরীক্ষা করবেন। দেখবেন তার মাথায় মেয়ে মানুষের মত লম্বা চুল আছে কি না; মুখে দাড়ির সাথে সাথে বড় বড় মোচও আছে কি না; পরনে ডোর কোপীন ও গায়ে আলখেল্লা আছে কি না; কারো বা গলায় উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের তসবি মালা আছে কিনা; যদি থাকে তাহলে বুঝবেন, সে আল্লাহর ওলী নয়, কামেল বুজূর্গ নয়, সাধু সজ্জন নয়; –বরং সে ইবলিস শয়তানের ছোট ভাই– সে আজাজিলের দোস্ত। অতএব ঐরূপ সাধু হতে আপনারা সাবধান! সাবধান!!

স মা প্ত

http://islaminonesite.wordpress.com

আন্তর্জাতিক গুণগত মান ও খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের সমন্বয়ে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ও গ্রহণযোগ্য আলিমগণের সম্পাদনায় প্রকাশিত সম্পূর্ণ গবেষণাধর্মী

সহীহুল বুখারী (বঙ্গানুবাদ)

১ম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ সহ পাঁচটি খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে। ৬ খণ্ডে সমাপ্ত

এতে ১৭টিরও অধিক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোন প্রকাশিত বুখারীতে নেই।

(১) আল-মু'জামুল মুফাহরাস ফি আলফাযিল হাদীস ও ফাতহুল বারীর ক্রমধারা অনুযায়ী হাদীস নম্বর সাজানো।
(২) একটি হাদীস বুখারীতে একাধিকবার উল্লেখ থাকলে একটি হাদীস দেখে বলা যাবে হাদীসটি কত যায়গায় আছে।
(৩) মুত্তাফাকুন 'আলাইহের হাদীসগুলো চিহ্নিত করা।
(৪) মুসনাদ আহমাদের হাদীস চিহ্নিত করা।
(৫) বাংলাদেশে প্রকাশিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও আধুনিক প্রকাশনীর হাদীসের নম্বর উল্লেখ এবং সে সকল হাদীস বা অধ্যায় তারা বাদ দিয়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত করণ।
(৬) হাদীসের বিরোধিতায় যারা টীকা লিখেছেন তাদের টীকার দলীলভিত্তিক জবাব প্রদান।
(৭) কুরআনের আয়াতগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে সূরার নাম সূরার নম্বর ও আয়াত নম্বর উল্লেখ করা।
(৮) বিশেষ বিশেষ আরাবী শব্দের সঠিক বাংলা পদ্ধতি অনুসরণ।
(৯) অধ্যায় ভিত্তিক বাংলা সূচীর পাশাপাশি আরাবী সূচীপত্র।
(১০) প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে পর্বের নম্বর উল্লেখ।
(১১) কিতাব বা পর্ব ভিত্তিক স্পেশাল সূচীপত্র।
(১২) গুরুত্বপূর্ণ টীকা ও ব্যাখ্যার আলাদা সূচীপত্র।
(১৩) হাদীসে কুদসী চিহ্নিত করে হাদীসের নম্বর উল্লেখ।
(১৪) মুতাওয়াতির হাদীস নির্দেশিকা।
(১৫) মাকতূ' হাদীস নির্দেশিকা।
(১৬) মাওকূফ হাদীস নির্দেশকা।
(১৭) পরবর্তী খণ্ডে যে সকল বিষয় থাকবে তার কিতাব বা পর্ব ভিত্তিক বিষয় নির্দেশিকা উল্লেখ।

সর্বোপরি রয়েছে উন্নতমানের ছাপা ও বাঁধাই

আমাদের রয়েছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পার্সেলে বই পাঠানোর বিশেষ ব্যবস্থা

প্রাপ্তিস্থান ঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন বংশাল ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১১৯০৩৬৮২৭২, ০১৭১৬৪৬৩৯৬

আসসালামু আলাইকুম|

আমরা মুহাম্মাদ আব্দুললাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)-এর লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করার উদ্যোগ নিয়েছি| আপনার কাছে যদি কোন বই থাকে তবে আমাদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দিতে পারেন | অথবা বইগুলো বিক্রি করতে পারেন| পরিবহন খরচ সহ বইয়ের দাম পরিশোধ করা হবে| নতুবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে পারেন| পরিবহন খরচ আমরা বহন করে স্ক্যান করে আবার আপনার কাছে পাঠিয়ে দিবো| বইগুলো প্রকাশের কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য থাকবে না| বরং ইসলামের প্রচারই মূল উদ্দেশ্য হবে| এছাড়া পুরাতন সহীহ আক্বীদার বই, পত্রিকা, তাওহীদ ট্রাস্টের বই গুলো দিতে পারেন| আললাহ আমাদের কবুল করুন| আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে এই লিংকে যোগাযোগ করুন| নতুবা সরাসরি ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন ০১৭৩৪৬৭২৯৬৮

http://islaminonesite.wordpress.com